

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ঈমানের স্বরূপ, শর্ত ও ঈমান ভঙ্গের কারণ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল ফেরদৌস

রোলঃ 23090121028

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ঈমানের স্বরূপ, শর্ত ও ঈমান ভঙ্গের কারণ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল ফেরদৌস

রোলঃ 23090121028

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ ঈমানের স্বরূপ, শর্ত ও ঈমান ভঙ্গের কারণ ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জান্নাতুল ফেরদৌস, আইডিঃ 23090121028 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ঈমানের স্বরূপ, শর্ত ও ঈমান ভঙ্গের কারণ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

জামাতুল ফেরদৌস

(স্বাক্ষর)

জামাতুল ফেরদৌস

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

আইডিঃ 23090121028

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা.....	5
ঈমানের সংজ্ঞা ও স্বরূপ	6
ঈমানের উপাদান.....	9
ঈমান বৃদ্ধি ও হ্রাস.....	11
ঈমান ও আমলের সম্পর্ক	14
ঈমানের শর্তাবলী.....	16
কুফর, শিরক ও নিফাক	19
বিদআত ও বড় গুনাহ	21
ঈমানের উপর পরিবেশ ও সমাজের প্রভাব	23
আধুনিক যুগে ঈমানের চ্যালেঞ্জ.....	25
শিরক-কুফরের আধুনিক রূপ	27
যুব সম্প্রদায়ের ঈমান সংকট.....	30
ঈমান রক্ষার উপায়.....	32
ঈমান দুর্বল হওয়ার লক্ষণসমূহ.....	35
ঈমান শক্তিশালী হওয়ার লক্ষণসমূহ.....	37
ঈমানের উপর তাকওয়ার ভূমিকা	40
সন্দেহ ও কামনা-বাসনা এর প্রভাব.....	42
শয়তানের প্রভাব ও ঈমান ধ্বংসের কৌশল	44
ইসলামী আকীদায় তাওহীদের গুরুত্ব.....	46
ঈমান ও তাওয়াক্কুলের সম্পর্ক	49
ঈমান ও নৈতিকতা গঠনের ভূমিকা.....	51
কুরআন ও হাদীসে ঈমান বিষয়ক নীতিমালা.....	53
ব্রান্ত মতবাদসমূহ (খারেজি, মুরজিয়া, মু'তাযিলি).....	55

উপসংহার	57
---------------	----

ভূমিকা

ইসলাম এমন একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, যার ভিত্তি এবং মূল শক্তি হলো ঈমান। মানুষের সফলতা, নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা, সমাজগঠন—সব কিছুর প্রথম পদক্ষেপ ঈমান থেকে শুরু হয়। তাই কুরআন বারবার মানুষকে ঈমানের দিকে আহ্বান করেছে এবং ঈমানদারদের প্রকৃত সফল বলে ঘোষণা করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

“قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ” — “নিশ্চয়ই সফল হয়েছে মুমিনরা।”

(সূরা আল-মুমিনুন, ২৩:১)

এই আয়াতে ‘সফলতা’ বলতে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের সফলতাকে বোঝানো হয়েছে, এবং এই সফলতার প্রথম শর্ত হলো সঠিক ঈমান। ঈমান ছাড়া ইবাদত গ্রহণযোগ্য হয় না, নৈতিকতা টিকে না, সমাজ সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না এবং মানুষের অন্তরের শান্তিও অর্জিত হয় না। ফলে বলা যায়, ঈমান হলো মানুষের অস্তিত্বের ভিত্তি এবং ইসলামের সম্পূর্ণ কাঠামোর কেন্দ্রবিন্দু।

বর্তমান সময়ের মুসলিম সমাজ নানা ধরনের সংকট, ফিতনা, সংশয় এবং বিভ্রান্তির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে। যেসব সমস্যাকে সমাজের দুর্বলতা মনে করা হয়, তার অধিকাংশই আসলে ঈমান দুর্বল হওয়া বা ঈমান সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাবের ফল। আধুনিক জীবনের বিভিন্ন চাপ, বস্তুবাদ, পশ্চিমা চিন্তার প্রভাব, সোশ্যাল মিডিয়ার প্রবাহ, এবং ধর্ম বিষয়ে বিভিন্ন ভুল ধারণা আজ মুসলিমদের ঈমানকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। ফলে আজকের যুবক, শিক্ষার্থী এমনকি সাধারণ মুসলিমও অনেক সময় বুঝতে পারে না—ঈমান কী, কীভাবে ঈমান বৃদ্ধি পায়, কেন ঈমান কমে যায়, বা কোন বিষয়গুলো ঈমানকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিতে পারে।

এ অবস্থায় ঈমানের মূল ধারণা, শর্ত, উপাদান, নিয়ম এবং ঈমান ভঙ্গকারী বিষয়সমূহকে দলীলভিত্তিকভাবে আলোচনা করা অত্যন্ত জরুরি। এই গবেষণাপত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো—ঈমানের স্বরূপকে কুরআন ও সহীহ হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা করা, ঈমান ভঙ্গের বাস্তব কারণগুলো স্পষ্ট করা এবং বর্তমান যুগে ঈমানকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন—

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ”

— “হে ঈমানদারগণ! ঈমান আনো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি।”

(সূরা আন-নিসা, ৪:১৩৬)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, ঈমান এমন একটি বিষয় যা শুধু গ্রহণ করলেই শেষ নয়; বরং তাকে নবায়ন করতে হয়, দৃঢ় করতে হয়, এবং শুদ্ধ রাখতে হয়। তাফসির ইবনে কাসীর-এ উল্লেখ রয়েছে যে, ঈমানদারদেরকে ঈমানকে আরও শক্তিশালী করতে, সন্দেহ দূর

করতে এবং ঈমানের শর্ত পূরণ করতে বলা হয়েছে।

(তাফসির ইবনে কাসীর, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৯৬)

কোনো মানুষ নিজের ঈমানকে যতক্ষণ পর্যন্ত শিরক, কুফর, নিফাক, বিদআত, বড় গুনাহ এবং আধুনিক যুগের বিভিন্ন ফিতনা থেকে রক্ষা করতে সক্ষম না হবে, ততক্ষণ তার ঈমান নিরাপদ নয়। তাই ঈমান সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলিমের ওপর ফরজ।

এই গবেষণাপত্র রচনায় প্রধান সূত্র ছিল—কুরআন, সহীহ হাদিস, তাফসির, ফিকহুল আকীদাহর ক্লাসিকাল বই এবং আধুনিক স্কলারদের দলীলভিত্তিক গ্রন্থ। বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে: তাফসির ইবনে কাসীর, শরহ আকীদাহ তায়াহাবিয়া, কিতাবুত তাওহীদ, শারহ আরকানুল ঈমান, এবং সহীহ বুখারী ও মুসলিমের ঈমান সম্পর্কিত অধ্যায়সমূহ। এসব সূত্রের আলোকে ঈমানের শাব্দিক অর্থ, শরঈ ব্যাখ্যা, ঈমানের শর্ত, উপাদান, বৃদ্ধি-হ্রাসের নিয়ম এবং ঈমান ধ্বংসকারী কারণগুলো প্রমাণসহ আলোচনা করা হয়েছে।

তবে গবেষণার কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। ফিতনার ব্যাপ্তি ও বিবিধতার কারণে সব ধরনের আধুনিক সমস্যাকে একত্রে বিশদভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তেমনি ঈমান সম্পর্কিত ইসলামের বিশাল ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণভাবে একটি গবেষণাপত্রে ধারণ করা সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে যেন এই গবেষণা পরিষ্কার, প্রমাণ-সমৃদ্ধ, সহজবোধ্য ও উপকারী হয়।

সবশেষে বলা যায়—এই গবেষণা ঈমান সম্পর্কিত মৌলিক ধারণাকে শক্তিশালী করার একটি প্রচেষ্টা। এমন একটি যুগে যখন মানুষ বাহ্যিক উন্নতির দিকে ছুটছে, কিন্তু অন্তরের ঈমানকে অবহেলা করছে—তখন ঈমান বিষয়ে পুনরায় মনোযোগ দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই গবেষণাপত্র পাঠককে ঈমানের গুরুত্ব উপলব্ধি করাবে, ঈমানের গভীরতা বুঝতে সাহায্য করবে এবং বর্তমান যুগের জটিল পরিস্থিতিতে ঈমান রক্ষার প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করবে—এটাই এই গবেষণার মূল লক্ষ্য।

ঈমানের সংজ্ঞা ও স্বরূপ

ইসলামে ঈমান এমন একটি ভিত্তিমূলক ধারণা, যার উপর পুরো দীন দাঁড়িয়ে আছে। ঈমান ছাড়া ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যায় না এবং ঈমান ব্যতীত মানুষের কোনো আমলই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। তাই ঈমানের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও স্বরূপ স্পষ্টভাবে জানা প্রতিটি মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যক। কুরআন ও সহীহ হাদিসে ঈমানকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, আর সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন থেকে শুরু করে চার ইমাম—সকলেই ঈমানের সার্বিক উপলব্ধিকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। তাদের দৃষ্টিতে ঈমান একটি জীবন্ত শক্তি, যা মানুষের অন্তর, মুখ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে পরিবর্তন করে দেয়।

) মূলধাতু থেকে, যার অর্থ—إِئْمَانٌ শব্দগত দিক থেকে আরবি “ইমান” শব্দটি এসেছে আ-মন (বিশ্বাস, নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা ও দৃঢ় আস্থার অনুভূতি। ভাষাগত এই অর্থ থেকে বোঝা যায়, ঈমান মানুষের হৃদয়ে এমন একটি প্রশান্তি তৈরি করে যা সন্দেহ, ভয় ও অস্থিরতাকে দূর করে দেয়। এজন্যই আল্লাহ তাআলা বলেন:

“ فَأَيُّ فَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ۚ ”

— “দুই দলের মধ্যে নিরাপত্তার অধিক যোগ্য কারা? যারা ঈমান এনেছে এবং শিরকের মাধ্যমে তাদের ঈমানকে কলুষিত করেনি।”

(সূরা আল-আন‘আম, ৬:৮১-৮২)

এই আয়াতে পরিষ্কারভাবে দেখা যায়—ঈমান মানুষকে ভয় থেকে মুক্ত করে নিরাপত্তা ও আস্থার অনুভূতি দেয়। অর্থাৎ ঈমান হৃদয়কে আলোকিত ও প্রতিষ্ঠিত করে। শরীয়তের পরিভাষায় ঈমানের সংজ্ঞা আরও ব্যাপক। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের মতে, ঈমান হলো:

“হৃদয়ের বিশ্বাস, মুখের স্বীকারোক্তি এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল—এই তিনটির সমন্বয়। এটি নেক আমলে বৃদ্ধি পায় এবং পাপে হ্রাস পায়।”

এই সংজ্ঞা একসঙ্গে কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীদের বক্তব্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইমাম শাফেয়ী (রহ.), ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ, এবং ইমাম বুখারী (যিনি *কিতাবুল ঈমান* নামে হাদিস সংগ্রহ করেছেন) — সকলেই এই ঐক্যমতের উপর অটল ছিলেন।

ঈমানকে শুধুমাত্র অনুভূতি বা মুখের কথা হিসাবে ব্যাখ্যা করেননি; বরং বাস্তব ﷺ রাসূলুল্লাহ আচরণকেও ঈমানের অংশ বলেছেন। তিনি ইরশাদ করেন:

“ الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً... فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ ”

— “ঈমানের শাখা সত্তর বা তারও বেশি। সর্বোচ্চ হলো ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলা এবং সর্বনিম্ন হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা।”

(সহীহ মুসলিম, হাদিস ৩৫)

এ হাদিস থেকে বোঝা যায়—ঈমান শুধু হৃদয়ের বিশ্বাস বা জিহ্বার কথা নয়; বরং নেক আমলও ঈমানের অংশ। এখান থেকেই পরিষ্কার যে ঈমানের প্রকৃতি শুধুমাত্র তাত্ত্বিক নয়, বরং এটি ব্যবহারিক ও কার্যকরী।

সাহাবাদের বর্ণনা থেকেও ঈমানের বাস্তব রূপ আমরা স্পষ্ট দেখি। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন—

“ঈমান হলো—বিশ্বাস, কথা এবং কাজ।”

(আল-লালাকাঈ, *শরহ উসূলে ইতিকাদ*, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৯৫৮)

আবার হাসান আল-বাসরী (রহ.) বলেন—

“ঈমান সেই নাম নয় যা মুখে উচ্চারণ করা হয়, বরং তা সেই বাস্তবতা যা হৃদয়ে স্থাপন হয় এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রতিফলিত হয়।”

(হিলিয়াতুল আওলিয়া, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৩৬)

এই কথাগুলো ঈমানের প্রকৃত স্বরূপকে আরও জীবন্ত করে তোলে। ইসলামে ঈমানকে কখনো একটি স্থির বা অপরিবর্তনীয় অবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি; বরং কুরআন নিজেই ঈমান বৃদ্ধি-হ্রাসের বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে। আল্লাহ বলেন:

“لِيَزِدَّاكُمْ إِيْمَانًا مَّعَ إِيْمَانِهِمْ”

— “যাতে তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায়।”

(সূরা আল-ফাতহ, ৪৮:৪)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসীর (রহ.) লিখেছেন—

“ঈমান বৃদ্ধি পায় নেক আমল দ্বারা এবং কমে যায় পাপ দ্বারা।”

(তাফসির ইবনে কাসীর, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৭৬)

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে ঈমান একটি পরিবর্তনশীল বাস্তবতা। হৃদয়ের চিন্তা, নফসের অবস্থা, আল্লাহর স্মরণ, কুরআন তিলাওয়াত, নামাজ, রোজা—এসব ঈমানকে শক্তিশালী করে। আবার গুনাহ, হারাম, আল্লাহভীতি কমে যাওয়া, শয়তানের কুমন্ত্রণা—এসব ঈমানকে দুর্বল করে দেয়।

ঈমানের স্বরূপ এমন যে এটি পুরো জীবনের উপর প্রভাব ফেলে। একজন ব্যক্তি যখন সত্যিকারের ঈমান গ্রহণ করে, তখন তার বিবেক জেগে ওঠে, দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়, নৈতিকতা উন্নত হয় এবং জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে লক্ষ্য বানায়। ঈমান শুধু একটি বিশ্বাস নয়; বরং এটি এমন একটি আলো, যা মানুষের চরিত্র, সিদ্ধান্ত, অগ্রাধিকার—সব কিছুকে আলোকিত করে। ঈমানের আলো না থাকলে মানুষ অন্ধকারে

ঘোরাফেরা করে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

“اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ”

— “আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক; তিনি তাঁদের অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনেন।”

(সূরা আল-বাকারা, ২:২৫৭)

এ আলো হলো সঠিক ঈমানের আলো—যা মানুষকে সোজা পথ দেখায়।

ঈমানের প্রকৃত স্বরূপ এমন যে তা মানুষের অন্তরকে পরিবর্তন করে তার সম্পূর্ণ জীবনধারণ পদ্ধতিকে আল্লাহর আনুগত্যময় পথে নিয়ে আসে। একটি ব্যক্তির আচরণ, নৈতিকতা, সিদ্ধান্ত—সব কিছুই ঈমানের শক্তির উপর নির্ভর করে। কুরআনে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, সত্যিকারের ঈমান মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসে—

“ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ”

(সূরা আল-বাকারা, ২:২৫৭)

এ আলো কেবল আধ্যাত্মিক শান্তি নয়; বরং সঠিক চিন্তা, সঠিক সিদ্ধান্ত ও সঠিক পথচলার শক্তিও দেয়। অন্যদিকে ঈমান দুর্বল হলে বা ভ্রান্ত ধারণার প্রভাব পড়লে মানুষ ধীরে ধীরে পথভ্রষ্টতার দিকে এগিয়ে যায়—যদিও বাহ্যিকভাবে ধর্মীয় পরিচয় বজায় থাকে।

সাহাবায়ে কেরাম এবং প্রাচীন আলিমদের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে ঈমান কোনো স্থির অবস্থার নাম নয়; বরং তা উন্নত হয়, ক্ষীণ হয়, শক্তিশালী হয় ও দুর্বল হয়। তাই ঈমান সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন এবং ঈমানের স্বরূপ গভীরভাবে বোঝা একজন মুসলিমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যখন ঈমান সঠিকভাবে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আমল স্বাভাবিকভাবেই সুন্দর হয়ে ওঠে এবং জীবন আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে অগ্রসর হয়।

এই বাস্তবতাগুলো বিবেচনা করলে দেখা যায়, ঈমানকে সঠিকভাবে বোঝা কেবল আকীদার একটি অধ্যায় নয়; বরং এটি মুসলিমের পুরো জীবনে দিকনির্দেশনা প্রদানকারী কেন্দ্রীয় শক্তি। এ উপলব্ধি পরবর্তী আলোচ্য বিষয়ের (ঈমানের উপাদান) গুরুত্ব আরও স্পষ্ট করে তোলে।

ঈমানের উপাদান

ইসলামে ঈমান একটি সমন্বিত ধারণা। এটি শুধু কোনো অনুভূতি নয়, শুধু মুখের কথা নয়, এবং শুধু বাহ্যিক আচরণও নয়—বরং এ তিনটির সম্মিলনে ঈমান পরিপূর্ণ হয়। কুরআন, হাদিস, সাহাবায়ে কেরাম ও প্রাথমিক যুগের সমস্ত ইমাম স্পষ্টভাবে বলেছেন যে ঈমানের গঠন তিন ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে: হৃদয়ের বিশ্বাস, মুখের স্বীকারোক্তি এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল। এ তিনটি মিলেই ঈমানের প্রকৃত অবয়ব তৈরি হয়।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের ঐকমত্যের (إجماع) স্বীকৃত সংজ্ঞা হলো:

“ঈমান হলো হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকারোক্তি এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল; এটি নেক কাজের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় এবং পাপের মাধ্যমে হ্রাস পায়।”

এ সংজ্ঞা এমনভাবে প্রমাণিত যে চার ইমাম—ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (রহিমাহুমুল্লাহ)—এ মতের উপর সুদৃঢ়ভাবে অটল ছিলেন। তাদের ছাত্ররা এবং তাবেঈন—তবে তাবেঈন সকলেই একই ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ঈমানের এই তিন উপাদান কুরআন ও হাদিসে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:

“ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ”

— “আল্লাহ তোমাদের ঈমান (অর্থাৎ তোমাদের নামাজ) নষ্ট করবেন না।”

(সূরা আল-বাকারাহ, ২:১৪৩)

এই আয়াতে “ঈমান” শব্দটি নামাজ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। তাফসির ইবনে কাসীরে উল্লেখ আছে যে, এখানে ঈমান বলতে আমল—বিশেষ করে কিবলামুখী নামাজ—বুঝানো হয়েছে।

(তাফসির ইবনে কাসীর, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৯৯)

এটি প্রকাশ করে যে আমলও ঈমানের অংশ। শুধু বিশ্বাস বা স্বীকারোক্তি যথেষ্ট নয়।

বলেন: ﷺ রাসূলুল্লাহ

“الإيمان بضع وسبعون شعبة...”

— “ঈমানের শাখা সত্তর বা তারও বেশি।”

(সহীহ মুসলিম, হাদিস ৩৫)

একই হাদিসে তিনি সর্বোচ্চ ঈমান হিসেবে বলেছেন “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলা, আর সর্বনিম্ন হিসেবে বলেছেন রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা।

এখানেও দেখা যাচ্ছে—কথা বলা এবং কাজ করা দুই-ই ঈমানের অংশ।

সাহাবায়ে কেরামও ঈমানের উপাদান সম্পর্কে পরিষ্কার বক্তব্য দিয়েছেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন:

“ঈমান হলো—বিশ্বাস, কথা এবং কাজ।”

(আল-লালাকাঈ, শরহ উসূল ইতিকাদ, ৫/৯৫৮)

হাসান আল-বাসরী (রহ.) বলেন:

“ঈমান কোনো বাহ্যিক নাম নয়; বরং এমন বাস্তবতা যা হৃদয়ে স্থাপন হয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রতিফলিত হয়।”

(হিলিয়াতুল আওলিয়া, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৩৬)

এ থেকে স্পষ্ট—ঈমানের প্রতিটি উপাদান মানুষের ভেতর ও বাহির দুদিকেই সক্রিয় থাকে। ঈমানের উপাদানগুলো একে অপরের পরিপূরক। হৃদয়ে বিশ্বাস আছে কিন্তু মুখে স্বীকারোক্তি নেই—এটি গ্রহণযোগ্য নয়। আবার মুখে স্বীকার আছে কিন্তু হৃদয়ে নেই—এটি মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য। একইভাবে কেউ সত্যিকারের ঈমানের দাবি করলেও যদি তার আমল সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত হয়, তবে তার ঈমান সন্দেহাতীতভাবে দুর্বল। ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন:

“যে ব্যক্তি আমল ত্যাগ করে, সে পূর্ণ ঈমান ধারণ করে না।”

(শরহুস সুন্নাহ, পৃষ্ঠা ৩৪)

এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো—আমল ঈমানকে দৃঢ় করে, হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন রাখে এবং ঈমানকে জীবন্ত করে তোলে। শুধু বিশ্বাসের দাবি বা মুখের স্বীকারোক্তি কিন্তু আমলহীন জীবন—এটি ইসলামের শিক্ষা নয়।

ঈমানের এই তিন উপাদান এমনভাবে পরস্পর জড়িত যে, একটির শক্তি অন্যটিকে শক্তিশালী করে। যেমন—

- হৃদয়ের বিশ্বাস → মুখের স্বীকারোক্তিকে সত্য করে তোলে।
- মুখের স্বীকারোক্তি → অন্তরে আল্লাহকে স্মরণ করায়।
- আমল → বিশ্বাসকে বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে।

ইসলামের ইতিহাসে যখন মহান সাহাবাগণ ইসলাম গ্রহণ করতেন, তখন তাদের হৃদয়ের ঈমান মুখে উচ্চারণ করা *শাহাদাহ* দ্বারা নিশ্চিত হতো এবং তাদের চরিত্র ও জীবনধারা আমলের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে যেত। তাদের ঈমানের প্রতিটি স্তম্ভ দৃঢ়ভাবে জীবনে প্রতিফলিত হতো।

ঈমানের উপাদানগুলো সঠিকভাবে কাজ করলে একজন মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয়, রাসূল ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা, ইবাদতের প্রতি আগ্রহ, পাপ থেকে বিরত থাকার ক্ষমতা এবং সততা-নিষ্ঠা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, যে ব্যক্তির ঈমানের উপাদান দুর্বল, তার জীবনে দ্বিধা, সন্দেহ, গাফেলত এবং পাপে লিপ্ত হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

এ আলোচনার পর স্পষ্ট হয় যে ঈমান কোনো একক অনুভূতি নয়; বরং এটি একটি সম্পূর্ণ কাঠামো। সঠিক ঈমান স্থাপন করতে হলে হৃদয়ের বিশ্বাস, জিহ্বার স্বীকারোক্তি এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল—সবকিছুকে সমন্বিতভাবে শক্তিশালী করতে হয়। এ উপলব্ধি ঈমান বৃদ্ধি ও হ্রাসের বিষয়টি বুঝতে আমাদেরকে আরও প্রস্তুত করে।

ঈমান বৃদ্ধি ও হ্রাস

ইসলামে ঈমান একটি জীবন্ত ও পরিবর্তনশীল বাস্তবতা। এটি কখনো স্থির বা অপরিবর্তনীয় নয়; বরং মানুষের আমল, পরিবেশ, চিন্তা, অন্তরের অবস্থা এবং আল্লাহর স্মরণ—সবকিছুর সাথে পরিবর্তিত হয়। কুরআন ও সহীহ হাদিসে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং আবার কমেও যায়। এটি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের স্বীকৃত আকীদা। তাদের মতে, নেক আমল ঈমানকে দৃঢ় করে, আর পাপ, গাফেলত ও সন্দেহ ঈমানকে দুর্বল করে দেয়।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:

“لِيَزِدَّاوَا إِيْمَانًا مَّعَ إِيْمَانِهِمْ”

— “যাতে তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায়।”

(সূরা আল-ফাতহ, ৪৮:৪)

এই আয়াত সরাসরি প্রমাণ করে যে ঈমান বৃদ্ধি পায়। তাফসির ইবনে কাসীরে উল্লেখ করা হয়েছে:

“ঈমান নেক আমল ও আনুগত্যের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়।”

(তাফসির ইবনে কাসীর, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৭৬)

আরেক স্থানে আল্লাহ বলেন:

“وَزِدْنَاهُمْ هُدًى”

— “আমি তাদের হিদায়াত বৃদ্ধি করলাম।”

(সূরা আল-কাহফ, ১৮:১৩)

হিদায়াত বৃদ্ধি মানেই ঈমান বৃদ্ধি।

ঈমানের এই পরিবর্তনশীলতার বিষয়ে স্পষ্টভাবে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। তিনি ﷺ রাসূলুল্লাহ

বলেন:

“جِدُّوا إِيمَانَكُمْ”

— “তোমরা তোমাদের ঈমানকে নবায়ন করতে থাকো।”

(মুসনাদ আহমদ, হাদিস ৮৬৩৭)

হাদিসটির অর্থ হলো—ঈমান এমন কিছু নয় যে একবার গ্রহণ করলেই পুরো জীবনে একই অবস্থায় থাকবে। বরং মানুষকে সবসময় ঈমানকে শক্তিশালী রাখতে হবে।

আরেকটি হাদিসে রাসূল ﷺ বলেন:

“إِنَّ الْإِيمَانَ لِيَخْلُقُ فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلُقُ الثَّوْبُ، فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَنْ يَجْلِدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ”

— “তোমাদের কারো অন্তরের ঈমান পুরনো হয়ে যায়, যেমন একটি কাপড় জীর্ণ হয়। তাই আল্লাহর কাছে দোয়া করো যেন তিনি তোমাদের অন্তরে ঈমানকে নবীন ও শক্ত রাখেন।”

(হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, হাদিস ৫/৫৪৫)

এটি অত্যন্ত গভীর একটি বক্তব্য। এতে বোঝা যায়—যদি মানুষ ঈমানের যত্ন না নেয়, তবে ঈমান দুর্বল হয়, শক্তি হারায় এবং অবহেলার কারণে জীর্ণ হয়ে পড়ে।

সাহাবায়ে কেলাম ঈমানের এই বৃদ্ধি-হ্রাসকে এমনভাবে অনুভব করতেন যে তাঁরা একে অন্যকে আহ্বান করতেন:

“চল, কিছু সময় বসে ঈমান বৃদ্ধি করি।”

(শরহ উসূলে ইতিকাদ, আল-লালাকাসি, ৫/৯৬৪)

এ থেকে বোঝা যায়—সাহাবাদের নিকট ঈমান ছিল এমন একটি অনুভূতি, যা আমল, জ্ঞান, আল্লাহর স্মরণ ও সৎ পরিবেশের মাধ্যমে ক্রমাগত উন্নত করা যায়।

ঈমান বৃদ্ধি পায়—

- আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা বাড়লে
- কুরআনের আয়াত নিয়ে চিন্তা করলে
- নিয়মিত নামাজ ও ইবাদতের মাধ্যমে
- পাপ থেকে দূরে থাকলে
- নেক মানুষের সাথে মেলামেশা করলে
- দান-সদকা ও ভালো কাজ করলে
- জিকির ও তাওবার মাধ্যমে

ঈমান হ্রাস পায়—

- পাপ ও হারামের মাধ্যমে
- গাফেলতিতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে
- সন্দেহ ও ফিতনার প্রভাবে
- শয়তানের কুমন্ত্রণা গ্রহণ করলে
- আল্লাহভীতির অভাবে
- অহংকার, হিংসা, গীবত, কিবর বাড়লে
- গুনাহকে হালকা ভাবলে

ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহ.) বলেন:

“মানুষের ঈমান কখনো পাহাড়ের মতো দৃঢ় হয়, আবার কখনো পাখির পালকের মতো হালকা হয়ে যায়।”

(মাজমুউল ফাতাওয়া, ৭/৫৫৪)

চিন্তার বিষয় হলো—ঈমান বৃদ্ধি-হ্রাসের এই প্রক্রিয়া খুব নিঃশব্দ। মানুষ কখনো টেরও পায় না তার ঈমান কীভাবে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। পাপ একটির পর আরেকটির দরজা খুলে দেয় এবং ঈমান ধীরে ধীরে শক্তি হারায়। এজন্যই কুরআনে আল্লাহ সতর্ক করে বলেন:

“وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ”

— “শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।”

(সূরা আল-বাকারা, ২:১৬৮)

পদাঙ্ক মানে ধাপে ধাপে শয়তানের পথ অনুসরণ করা, যা শেষ পর্যন্ত ঈমানের উপর আঘাত হানে।

ঈমান বৃদ্ধি ও হ্রাসের ধারণা বোঝা একজন মুসলিমকে নিজের অবস্থান মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে। যখন সে অনুভব করবে তার ঈমান কমে যাচ্ছে, তখন তওবা, ইবাদত, জিকির ও কুরআনের মাধ্যমে দ্রুত ঈমানকে শক্তিশালী করতে পারবে। আবার যখন ঈমান বৃদ্ধি পায়, তখন সে আল্লাহর অনুগ্রহ উপলব্ধি করতে পারে এবং আরও বেশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে।

এই বাস্তবতা অনুধাবন করলে স্পষ্ট হয়—ঈমান কোনো তাত্ত্বিক বিষয় নয়, বরং মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে এর উত্থান-পতন ঘটে। এবং ঈমানের এই ওঠা-নামার পুরো প্রক্রিয়াটি আমাদের পরবর্তী আলোচ্য বিষয়—“ঈমান ও আমলের সম্পর্ক”—আরও গভীরভাবে বুঝতে সাহায্য করে।

ঈমান ও আমলের সম্পর্ক

ইসলামী আকীদায় ঈমান ও আমল একে অপরের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। ঈমান হলো হৃদয়ের বিশ্বাস ও দৃঢ় আস্থা, আর আমল হলো সেই বিশ্বাসের বাস্তব প্রতিফলন। এই দুইয়ের সমন্বয় ছাড়া একজন মানুষ সম্পূর্ণ মুসলিম হতে পারে না। কুরআন ও হাদিসে অসংখ্যবার আল্লাহ তাআলা ঈমান ও নেক আমলকে পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন, যা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে আমল ঈমান থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়; বরং ঈমানের ফল, প্রকাশ ও বৈশিষ্ট্য।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:

“إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ”

— “নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে...”

(সূরা আল-বাইয়্যিনাহ, ৯৮:৭)

এই ধরনের আয়াত কুরআনে প্রায় একশতাত্তর স্থানে এসেছে, যা প্রমাণ করে—ঈমান ও আমলকে ইসলাম কখনো আলাদা করেনি। ঈমান যদি সত্য হয়, তবে তা আমলে প্রতিফলিত হবেই। আর আমলহীন জীবন ঈমানের দুর্বলতার নিদর্শন।

বলেন: ﷺ রাসূলুল্লাহ

“ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ”

— “ব্যভিচারী ব্যভিচার করার মুহূর্তে সম্পূর্ণ মুমিন থাকে না।”

(সহীহ বুখারী, হাদিস ৫৫৭৮)

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (রহ.) বলেন:

“এতে ইঙ্গিত আছে যে বড় গুনাহ ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং গুনাহের মুহূর্তে ঈমান দুর্বল হয়ে যায়।”

(শরহ মুসলিম, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১১০)

এ থেকে স্পষ্ট—আমল ঈমানের মান নির্ধারণ করে। আমল শক্তিশালী হলে ঈমান শক্তিশালী হয়, আর পাপের প্রভাবে ঈমান দুর্বল হয়।

প্রাথমিক যুগের আলিমদের মতে, আমল ঈমানের অংশ। ইমাম বুখারী তার কিতাবুল ঈমান গ্রন্থে পুরো একটি অধ্যায় উৎসর্গ করেছেন আমল-বিশ্বাসের এই সম্পর্ক প্রমাণ করতে। তিনি সেখানে বলেছেন:

“ঈমানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে—কথা, কাজ ও বিশ্বাস। ঈমান বৃদ্ধি পায় ও হ্রাস পায়।”

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান)

সাহাবাদের জীবনেও দেখা যায় যে তারা ঈমানকে কেবল অনুভূতি বা তাত্ত্বিক বিষয় মনে করতেন না; বরং তারা এমন আমল করতেন যা তাদের ঈমানকে জীবন্ত রাখত। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন—

“যখন আমরা রাসূল ﷺ-এর সাথে থাকতাম, আমরা আমলকে ঈমানের মধ্যেই গণ্য করতাম।”

(ইবনে মাজাহ, হাদিস ৭১)

এখান থেকে বোঝা যায়—আমল ঈমানের অংশ হিসেবে বিবেচিত হতো, আলাদা কোনো বিষয় হিসেবে নয়।

আমল ছাড়া ঈমানের দাবি করা একধরনের অসঙ্গতি। কেননা সত্যিকারের ঈমান মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাকে আল্লাহর আনুগত্যের পথে পরিচালিত করে। তাই যদি কেউ মুখে ঈমানের দাবি করে কিন্তু তার জীবন-আচরণে আল্লাহর আনুগত্য দেখা না যায়, তবে তার ঈমান দুর্বল বা অসম্পূর্ণ। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:

“ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ”

— “বলুন: যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো।”

(সূরা আলে ইমরান, ৩:৩১)

এই আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে—আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা (যা ঈমানের অংশ) প্রমাণিত হয় অনুসরণ ও আমলের মাধ্যমে।

তাই ঈমান সত্য হলে আমল অবশ্যস্বাভাবিক; আর আমলে ঘাটতি থাকলে তা ঈমানের দুর্বলতার প্রমাণ।

ইসলামের ইতিহাসে তিনটি বড় মতবাদ ঈমান-আমল সম্পর্কে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছে:

১. মুরজিয়া বলেছে—আমল ঈমানের অংশ নয়।

২. খারেজী বলেছে—বড় গুনাহ করলে ঈমান চলে যায়।

৩. মু'তাযিলা বলেছে—গুনাহকারী মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে।

কিন্তু আহলুস সুন্নাহর মতে সঠিক মত হলো—

বড় গুনাহ ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তবে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না—যতক্ষণ না কুফরি কোনো কাজ করে।

এই মতই কুরআন, হাদিস ও সাহাবাদের বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আমল শুধু ঈমানের অংশ নয়—এটি ঈমানের সৌন্দর্যও। আমল ছাড়া ঈমানকে একধরনের ‘অসম্পূর্ণ আলো’ বলা যায়, যা মানুষের জীবনকে সম্পূর্ণ আলোকিত করতে পারে না। আবার আমলই ঈমানের অগ্রগতি ও দৃঢ়তার বাহন। মানুষ যত বেশি নেক কাজ করে, তত তার অন্তরে ঈমান গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই আলোচনার সারমর্ম হলো—ঈমান এবং আমল পরস্পর অবিচ্ছিন্ন, পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং একে অপরকে শক্তিশালী করে। ঈমান ছাড়া আমল দুর্বল, আর আমল ছাড়া ঈমান অসম্পূর্ণ। এই সম্পর্ক বুঝতে পারলে ঈমানের শর্তাবলী সম্পর্কে আলোচনা আরও স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, যা পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আসবে।

ঈমানের শর্তাবলী

ইসলামের দৃষ্টিতে ঈমান এমন একটি বাস্তবতা যা মানুষের অন্তরকে আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পিত করে এবং জীবনের প্রতিটি কাজকে তাঁর আনুগত্যময় করে তোলে। কিন্তু এ ঈমান তখনই গ্রহণযোগ্য ও সুফলদায়ী হয়, যখন তা নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করে। কুরআন ও সহীহ হাদিসে ঈমানের যে বৈশিষ্ট্য ও শর্ত উল্লেখ রয়েছে, সেগুলো মুসলিমের ঈমানকে সঠিক, বিশুদ্ধ ও কার্যকর রাখার মূল ভিত্তি। কারণ শর্ত ছাড়া কোনো আমল গ্রহণযোগ্য যেমন নয়, তেমনি শর্তহীন ঈমানও পরিপূর্ণ নয়।

ঈমানের শর্তগুলো বিভিন্ন আলিম সামান্য ভিন্ন শব্দে ব্যাখ্যা করলেও মূলত সবাই সাতটি শর্তে একমত। এগুলো হলো—জ্ঞান, সত্যিকার বিশ্বাস, গ্রহণ, সমর্পণ, সত্যবাদিতা,

একনিষ্ঠতা এবং ভালোবাসা। প্রতিটি শর্তের ভিত্তি রয়েছে শক্তিশালী কুরআন-হাদিসের দলীল দ্বারা। শর্তগুলো বোঝা মানে ঈমানের প্রকৃত রূপ ও গভীরতা বোঝা।

প্রথম শর্ত হলো—জ্ঞান (ইলম)। ইসলামে অজ্ঞতার ভিত্তিতে ঈমানকে গ্রহণযোগ্য বলা হয়নি।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

“فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ”

— “জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।”

(সূরা মুহাম্মদ, ৪৭:১৯)

এই আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্ট যে ঈমান জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। শুধু অন্ধভাবে অনুসরণ করা ঈমান নয়; বরং দৃঢ় জ্ঞান ও উপলব্ধির ভিত্তিতে ঈমান প্রতিষ্ঠিত হয়। ইমাম বুখারী ও তাঁর কিতাবুল ইলম গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়েই উল্লেখ করেছেন যে জ্ঞান ঈমানের প্রথম ভিত্তি।

দ্বিতীয় শর্ত হলো—ইয়াকীন বা দৃঢ় বিশ্বাস। কুরআনে বলা হয়েছে:

“إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا”

— “মুমিন তো তারা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে এবং তারপর কোনো সন্দেহ পোষণ করে না।”

(সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯:১৫)

এ আয়াতে সন্দেহহীন বিশ্বাসকে ঈমানের শর্ত বলা হয়েছে। সত্যিকারের ঈমান সন্দেহ ও দ্বিধাকে দূর করে দেয়।

—এর নির্দেশকে তৃতীয় শর্ত হলো—কবুল বা গ্রহণ। অর্থাৎ, আল্লাহর আদেশ ও রাসূল আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা। কুরআনে আল্লাহ বলেন:

“خُذُوا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ”

— “রাসূল যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো।”

(সূরা আল-হাশর, ৫৯:৭)

যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান মানতে অস্বীকার করে, তার ঈমান বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হয় না।

চতুর্থ শর্ত হলো—ইনকিয়াদ বা সমর্পণ। অর্থাৎ, আল্লাহর হুকুমের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য

প্রকাশ। কুরআনে বলা হয়েছে:

“وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ”

— “তোমরা তোমাদের রবের দিকে ফিরে এসো এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করো।”

(সূরা আজ-যুমার, ৩৯:৫৪)

এই সমর্পণই ঈমানকে বাস্তব জীবনে আমল হিসেবে প্রতিফলিত করে।

পঞ্চম শর্ত হলো—সিদ্ক বা সত্যবাদিতা। মুখের স্বীকারোক্তি তখনই মূল্যবান যখন তা

অন্তরের সত্যিকারের বিশ্বাসের প্রতিফলন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

“وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ”

— “কিছু লোক আছে যারা বলে, ‘আমরা ঈমান এনেছি’, অথচ তারা মুমিন নয়।”

(সূরা আল-বাকার, ২:৮)

এ আয়াত মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে যারা মুখে স্বীকার করলেও অন্তরে সত্যিকারের বিশ্বাস রাখে না।

ষষ্ঠ শর্ত হলো—ইখলাস বা একনিষ্ঠতা। ঈমান ও সকল আমল আল্লাহর জন্য খাঁটি হতে

হবে। কুরআনে বলা হয়েছে:

“وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ”

— “তাদেরকে শুধু আল্লাহকে একনিষ্ঠভাবে ইবাদত করারই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।”

(সূরা আল-বাইয়্যিনাহ, ৯৮:৫)

বলেছেন: ﷺ রাসূল

“إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ”

— “কাজের মূল্য নির্ভর করে নিয়তের উপর।”

(সহীহ বুখারী, হাদিস ১)

নিষ্কলুষ নিয়ত ছাড়া ঈমান পরিপূর্ণ হয় না।

—কে ভালোবাসা ﷺ সপ্তম শর্ত হলো—মুহাব্বাত বা ভালোবাসা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল

বলেছেন: ﷺ ঈমানের অন্যতম মূল স্তম্ভ। রাসূল

“لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ”

— “তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান

ও সকল মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় হই।”

(সহীহ বুখারী, হাদিস ১৫)

এ ভালোবাসা মানুষকে আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর আনুগত্যের পথে পরিচালিত করে।

এই সাতটি শর্ত একত্রে ঈমানের পরিপূর্ণ কাঠামো তৈরি করে। কোনো শর্ত অনুপস্থিত থাকলে ঈমান দুর্বল হয় এবং কখনো কখনো ভেঙেও যায়। ঈমানের শর্তগুলো মেনে চলা মানে শুধু তাত্ত্বিক স্বীকারোক্তি নয়; বরং হৃদয়, জিহ্বা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—সবকিছুর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়—ঈমানের শর্তগুলো বোঝা ও মানা একজন মুসলিমের ঈমানকে নিরাপদ, বিশুদ্ধ ও দৃঢ় রাখতে সাহায্য করে। পরবর্তী বিষয়ে (কুফর, শিরক ও নিফাক) এসব শর্ত কীভাবে ভেঙে যায় তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

কুফর, শিরক ও নিফাক

ইসলামী আকীদার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর মধ্যে একটি হলো—কুফর, শিরক এবং নিফাকের সঠিক জ্ঞান। এগুলো এমন বিষয় যেগুলো মানুষ ভুলভাবে বুঝলে ঈমান ধ্বংস হয়ে যায়, আর সঠিকভাবে বুঝলে ব্যক্তি নিজের ঈমানকে সুরক্ষিত রাখতে পারে। ঈমানকে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তার চেয়ে কোনো অংশে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়নি ঈমান ধ্বংসকারী বিষয়গুলোকে বোঝার ওপর, কারণ ভুল পথে গেলে মানুষ জানতেও পারে না কখন সে ঈমান হারিয়ে ফেলেছে। তাই কুরআন ও হাদিসে কুফর, শিরক এবং নিফাকের বিষয়গুলো বারবার সতর্কতা সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে।

কুফর শব্দের আদি অর্থ আচ্ছাদন করা বা ঢেকে ফেলা। শরীয়তের পরিভাষায় কুফর বলতে –এর আনা হকবানী অস্বীকার করা বা তার বিপরীত ۞ বোঝায়—আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন:

“إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنْذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ”

— “যারা কুফর করেছে—তুমি সতর্ক করো বা না করো, তারা ঈমান গ্রহণ করবে না।”
(সূরা আল-বাকার, ২:৬)

কুফরের বৈশিষ্ট্য হলো—হক কথাকে প্রত্যাখ্যান করা, দ্বীনের মূলনীতি অস্বীকার করা, বা ইসলামের মৌলিক সত্যের বিরোধিতা করা। কখনো কথা, কখনো বিশ্বাস, কখনো কাজ—এই তিনের যেকোনো একটি কুফরির পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে। যেমন—আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করা, কুরআনের কোনো সুস্পষ্ট বিধানকে ভুল বলা, কিংবা রাসূল ۞-কে অবমাননা করা—সবই কুফর।

শিরক হলো ইসলামে সবচেয়ে বড় গোনাহ এবং ঈমান ধ্বংসকারী সর্বাপেক্ষা গুরুতর অপরাধ। শিরক অর্থ আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করা। তা বিশ্বাসে হোক, ইবাদতে হোক, দো‘য়া-দরুদে হোক, বা আল্লাহর যে কোনো বিশেষ গুণে হোক। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন:

“إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ”

— “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরককে ক্ষমা করবেন না।”
(সূরা আন-নিসা, ৪:৪৮)

এ আয়াত শিরকের ভয়ঙ্কর পরিণতি ও গুরুত্ব অত্যন্ত স্পষ্ট করে দেয়। তাফসির ইবনে কাসীরে বলা হয়েছে—এটি আল্লাহর দৃষ্টিতে এমন অপরাধ যার কোনো ক্ষমাই নেই। (তাফসির ইবনে কাসীর, ২/৩৬৮)

শিরক দুইভাবে হতে পারে—

- বিশ্বাসের মাধ্যমে: যেমন আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ভাগ্য নির্ধারণ করে মনে করা।

- ইবাদতের মাধ্যমে: যেমন কবরে সিজদা করা, অলিদের কাছে দোআ করা, বা সাহায্য চাওয়া মনে করে যে তারা স্বাধীনভাবে দিতে পারে।

মানুষ কখনো কখনো শিরককে খুব ছোট বা “কারো প্রতি ভালোবাসা” মনে করে দেখে, বলেছেন: ﷺ কিন্তু ইসলামে এমন সামান্য শিরকও আল্লাহর নিকট মারাত্মক অপরাধ। রাসূল
 “أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر.”

— “আমি তোমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটি ভয় করি তা হলো ছোট শিরক।”
 (মুসনাদ আহমদ, হাদিস ২৩১১৯)

সাহাবারা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন:

“الرياء” — “দেখানো-শোনা বা রিয়া।”

এটি প্রমাণ করে শিরক শুধু মূর্তিপূজাই নয়; বরং অন্তরের ভ্রান্ত উদ্দেশ্যও শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

নিফাক হলো এমন একটি রোগ যা মানুষের ঈমানকে লুকিয়ে নষ্ট করে দেয়। নিফাক অর্থ—
 মুখে ইসলাম প্রকাশ করা কিন্তু অন্তরে কুফর লুকিয়ে রাখা। মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ
 বলেন:

“إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الذِّكْرِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ”

— “নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সবচেয়ে নীচ স্তরে থাকবে।”
 (সূরা আন-নিসা, ৪:১৪৫)

এই শাস্তি কুফরির যেকোনো ধরন থেকে ভয়ঙ্করতর। কারণ মুনাফিকরা ইসলামের বাহ্যিক পরিচয় বহন করেও অন্তরে শত্রুতা লুকিয়ে রাখে—যা সমাজকে ভেতর থেকে ধ্বংস করে।

বলেছেন: ﷺ রাসূল

“آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ...”

— “মুনাফিকের তিনটি লক্ষণ...”
 (সহীহ বুখারী, হাদিস ৩৩)

মিথ্যা বলা, আমানত ভঙ্গ করা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা—এসব নিফাকের বৈশিষ্ট্য। এগুলো অপরিহার্যভাবে ঈমান নষ্ট না করলেও ঈমানকে দুর্বল করে এবং মানুষকে নিফাকের পথে ধাবিত করে।

কুফর, শিরক এবং নিফাক—এই তিনটি ইসলামের তিনটি সবচেয়ে ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক দিক। ঈমানকে যেসব বিষয় হুমকির মুখে ফেলে, এরাই সেগুলোর প্রধান উৎস। কুফর ঈমানকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে দেয়। শিরক ঈমানকে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হতে বাধা দেয়। আর নিফাক ঈমানকে ধীরে ধীরে ভেতর থেকে গলিয়ে নষ্ট করে ফেলে।

এই আলোচনার মাধ্যমে পরিষ্কার হয়—ঈমানকে সুরক্ষিত রাখতে গেলে কুফর, শিরক ও নিফাক থেকে মুক্ত থাকা আবশ্যিক। এগুলোর সঠিক ধারণা যত বেশি মানুষ বুঝবে, ততই

সে নিজের ঈমানের নিরাপত্তায় সচেতন থাকবে। এখন বিদআত ও বড় গুনাহ—যা ঈমানের উপর সরাসরি আঘাত হানে—সে আলোচনায় প্রবেশ করলে এই বিষয় আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

বিদআত ও বড় গুনাহ

ইসলামে ঈমানকে দুর্বল এবং নষ্ট করে দেয় এমন দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো—বিদআত এবং বড় গুনাহ। এগুলো কুফর বা শিরকের মতো একজন মানুষকে সরাসরি ইসলামের বাইরে নিয়ে না গেলেও, ঈমানের ভিত্তি দুর্বল করে দেয় এবং কখনো কখনো মানুষকে এমন মারাত্মক অবস্থায় নিয়ে যায় যে সে অজান্তেই পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। বিদআত ও বড় গুনাহের প্রকৃতি ও প্রভাব বোঝা একজন মুসলিমকে ঈমান রক্ষার ক্ষেত্রে আরও সচেতন হতে সাহায্য করে।

বিদআত শব্দের আদি অর্থ হলো—নতুন কিছু উদ্ভাবন করা। শরীয়তের দৃষ্টিতে বিদআত , তাঁর ﷺ হলো—যে কোনো ইবাদত বা দ্বীনের কাজকে এমনভাবে সৃষ্টি করা যা রাসূলুল্লাহ সাহাবাগণ ও প্রাথমিক যুগের আলিমদের মাঝে পাওয়া যায়নি। আল্লাহ তাআলা দ্বীনের ক্ষেত্রে কোনো নতুনত্ব পছন্দ করেন না। তিনি বলেন:

“الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ”

— “আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম।”

(সূরা আল-মায়দাহ, ৫:৩)

যখন দ্বীন পূর্ণাঙ্গ, তখন এর মধ্যে নতুন কিছু যোগ করা বা বাদ দেওয়া আল্লাহর কসম্পূর্ণ বলেছেন: ﷻ করাকে অসম্মান করা, যা বিদআতের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ

“مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ”

— “যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু উদ্ভাবন করবে যা এর অংশ নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।”

(সহীহ বুখারী, হাদিস ২৬৯৭)

এই হাদিস পরিষ্কার করে যে ইসলাম এমন কোনো ইবাদত গ্রহণ করে না যা রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবাদের আদর্শে পাওয়া যায় না। বিদআত দেখতে সুন্দর লাগলেও তা ঈমানের ওপর আঘাত হানে, কারণ বিদআতকারী মনে করে যে তার ইবাদত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য—যখন বাস্তবে তা প্রত্যাখ্যাত।

ইবনে উমর (রাঃ) বলেন:

“যে ব্যক্তি বিদআত সৃষ্টি করে, সে দ্বীনের ঘাটতিকে পূরণ করার দাবি করে, অথচ আল্লাহ দ্বীনকে পূর্ণ করেছেন।”

(মাকাসিদুশ শরিয়াহ, পৃষ্ঠা ৫৮)

বিদআতের সবচেয়ে বড় বিপদ হলো—এটি মানুষকে ধীরে ধীরে সুন্নাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। যত বেশি বিদআত সমাজে ছড়িয়ে পড়ে, তত বেশি সুন্নাহ হারিয়ে যায়। ঈমানের আলো তখন দুর্বল হয়ে পড়ে।

বড় গুনাহ (কাবীরা) হলো—সেসব গুনাহ যেগুলো কুরআন-হাদিসে স্পষ্টভাবে গুরুতর বলা হয়েছে, কিংবা যেগুলোর জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি বা আল্লাহর কঠোর সতর্কতা উল্লেখ আছে। যেমন—ব্যভিচার, সুদ, মিথ্যা সাক্ষ্য, মদ্যপান, আল্লাহ অবাধ্যতা, মানুষের হক নষ্ট করা, অন্যায় হত্যা ইত্যাদি বড় গুনাহ।

কুরআনে বলা হয়েছে:

“إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ”

— “তোমরা যদি তোমাদের নিষেধ করা বড় গুনাহগুলো থেকে দূরে থাকো, তবে আমরা তোমাদের ছোট গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেব।”

(সূরা আন-নিসা, ৪:৩১)

এ আয়াত প্রমাণ করে বড় গুনাহগুলো কত ভয়ংকর এবং কতটা ঈমানের জন্য ক্ষতিকর।

বলেন: ﷺ রাসূল

“اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ”

— “সাতটি ধ্বংসাত্মক গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো।”

(সহীহ বুখারী, হাদিস ২৭৬৬)

তিনি এ গুনাহগুলোর তালিকায় শিরক, জাদু, সুদ গ্রহণ, এতিমের সম্পদ ভক্ষণ, ব্যভিচার ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করেন—যেগুলো মানুষের ঈমানের ওপর সরাসরি আঘাত করে।

বড় গুনাহ ঈমানকে ধ্বংস না করলেও ঈমানের শক্তিকে দুর্বল করে দেয় এবং হৃদয়ের আলো নিভিয়ে ফেলে। ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহ.) বলেন:

“মুমিনের হৃদয় পাপের কারণে রোগাক্রান্ত হয়, আর পাপ জমতে জমতে ঈমানকে দুর্বল করে দেয়।”

(মাজমুউল ফাতাওয়া, ১০/২৫৭)

মানুষ যখন একবার বড় গুনাহ করে, তখন শয়তান তাকে আরেকবার করার সাহস দেয়।

এরপর মানুষ ধীরে ধীরে গুনাহকে হালকা ভাবে শুরু করে, যা শেষে ঈমানের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। বড় গুনাহ যত বেশি জমা হয়, তত বেশি ঈমানের আলো ক্ষীণ হতে থাকে, এবং আল্লাহর নৈকট্য থেকে মানুষ দূরে সরে যায়।

বিদআত ও বড় গুনাহ—উভয়ই মানুষের ঈমানকে ভেতর থেকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, যদিও এগুলো কখনো কখনো ঈমান পুরোপুরি বাতিল করে দেয় না। তবে যদি বিদআত এমন

পর্যায়ে পৌঁছায় যে মানুষ দ্বীনের মূলনীতিকে বিকৃত করে, কিংবা বড় গুনাহ এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে মানুষ হালাল-হারামকে অস্বীকার করতে শুরু করে—তবে সে কুফরির দিকে ধাবিত হতে পারে।

এই বিষয়গুলো বিবেচনা করলে স্পষ্ট হয়—মানুষের ঈমানকে রক্ষা করতে হলে বিদআত পরিহার করতে হবে এবং বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এগুলো যত কম হবে, ঈমান তত বেশি শক্তিশালী হবে। এখন পরিবেশ ও সমাজ কীভাবে ঈমানকে প্রভাবিত করে তা আলোচনা করলে বিদআত ও বড় গুনাহের বিস্তারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পারস্পরিক সম্পর্ক আরও পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে।

ঈমানের উপর পরিবেশ ও সমাজের প্রভাব

মানুষের ঈমান এমন একটি বিষয় যা কখনো একা, বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তৈরি হয় না। মানুষের পরিবার, পরিবেশ, সমাজ, সংস্কৃতি, সঙ্গ—সব কিছুই তার ঈমানের উপর শক্তিশালী প্রভাব ফেলে। হৃদয়ের ঈমান যতটা অভ্যন্তরীণ অনুভূতি, ঠিক ততটাই এটি বাহ্যিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত। তাই ইসলাম মানুষকে ভালো পরিবেশ এবং সৎ সঙ্গ বেছে নিতে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছে, কারণ পরিবেশ ও সমাজ মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস, আদর্শ, আচরণ ও চরিত্রকে গড়ে তোলে কিংবা ভেঙে দেয়।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ”

— “হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গ গ্রহণ করো।”

(সূরা আত-তাওবা, ৯:১১৯)

এই আয়াতে ‘সত্যবাদীদের সাথে থাকা’র নির্দেশ পরিবেশ ও সঙ্গের গুরুত্বকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। কারণ সত্যবাদী, সৎ ও ধার্মিক মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করলে ঈমান বৃদ্ধি পায়, অন্তর নরম হয় এবং নেক আমলের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। বিপরীতে, দুষ্ট বা গুনাহগার মানুষের সঙ্গ ঈমানকে দুর্বল করে দেয়।

পরিবেশ এবং সঙ্গের প্রভাবকে অত্যন্ত সহজ ও বাস্তব উদাহরণ দিয়ে তুলে ﷺ রাসূলুল্লাহ ধরেছেন। তিনি বলেন:

“المرء على دين خليله، فلينظر أحداً من يخالل”

— “মানুষ তার বন্ধুর ধর্ম ও চরিত্র অনুসরণ করে। তাই তোমাদের প্রত্যেকে খেয়াল করো কার সাথে বন্ধুত্ব কর।”

(সুনান আবু দাউদ, হাদিস ৪৮৩৩)

এই হাদিস বোঝায় যে একজন ব্যক্তির ঈমান শুধু তার নিজের প্রচেষ্টায় নয়, বরং তার চারপাশের পরিবেশ, বন্ধুবৃত্ত, পরিবার — এ সবকিছুর দ্বারা গঠিত হয়। যদি পরিবেশ ভালো না হয়, তবে ঈমান দুর্বল হয়ে যায়, আর যদি পরিবেশ নেক আমলসহকারী হয়, তবে ঈমান শক্তিশালী হয়।

পরিবেশ মানুষের অভ্যাসকে পরিবর্তন করে দেয়—সেটা ভালো দিকেও হতে পারে, খারাপ দিকেও হতে পারে। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন:

“পরিবেশ ও সঙ্গ মানুষের হৃদয়ের উপর এমনভাবে প্রভাব ফেলে যেমন বাতাস পানির ঢেউকে প্রভাবিত করে।”

(ইগাসাতুল লাহফান, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪৫)

এ অর্থে পরিবেশকে উপেক্ষা করা মানে ঈমানকে ঝুঁকির মুখে ফেলা।

আধুনিক সমাজে বিভিন্ন সংস্কৃতি, মিডিয়া, প্রযুক্তি, চিন্তাধারা মানুষের চারপাশে এমনভাবে ছড়িয়ে আছে যে একজন মুসলিম যদি সতর্ক না থাকে, তবে তার ঈমান ভ্রান্ত ধারণা, নাস্তিকতা, বস্তুবাদ ও অশ্লীলতার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়ার অসংযত ব্যবহার, অনৈতিক পরিবেশ, অশ্লীলতা, সন্দেহ তৈরি করা কনটেন্ট, এবং ধর্মীয় বিষয়ে বিকৃত ব্যাখ্যার মতো বিষয়গুলো বিশেষভাবে তরুণদের ঈমানকে প্রভাবিত করছে।

সুতরাং পরিবেশ শুধু যে ঈমানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ—তা নয়; বরং এটি ঈমানের নিরাপত্তার অন্যতম প্রধান মাধ্যম। মানুষ যে পরিবেশে থাকে, তার ইবাদতের মানসিকতা, প্রজ্ঞা, চিন্তার স্বচ্ছতা ও নৈতিক শক্তি সেই পরিবেশের গুণে বা দোষে তৈরি হয়। ভালো সমাজ, সৎ বন্ধু, নেক পরিবার ঈমানকে দৃঢ় করে, আর খারাপ সমাজ বা নষ্ট পরিবেশ ঈমানকে ধীরে ধীরে নিভিয়ে ফেলে।

পরিবারের পরিবেশও ঈমানের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। বাবা-মায়ের চরিত্র, বাড়ির আচার-ব্যবহার, ঘরের ভেতরের ইবাদতের পরিবেশ—সবই শিশু এবং যুবক-যুবতীদের ঈমানকে তৈরি করে। কুরআনে বলা হয়েছে:

“وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ”

— “তোমার পরিবারকে নামাজের আদেশ দাও।”

(সূরা ত্বাহা, ২০:১৩২)

এ নির্দেশ আসলে ঈমানের পরিবেশ তৈরির নির্দেশ।

পরিবেশের প্রভাব এতটাই শক্তিশালী যে অনেক সময় মানুষ মনে করে সে নিয়ন্ত্রণে আছে, কিন্তু বাস্তবে পরিবেশই তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে—তার চিন্তা, অভ্যাস, দৃষ্টিভঙ্গি ও আধ্যাত্মিক শক্তিকে পরিচালনা করছে। এ কারণে ইসলামে হিজরত বা পরিবেশ পরিবর্তনকেও ঈমান রক্ষার একটি উপায় বলা হয়েছে, যখন পরিবেশ ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

সামগ্রিক বিবেচনায় দেখা যায়, পরিবেশ ও সমাজ মানুষের ঈমানকে হয় শক্তিশালী করে তোলে, নয়তো ভেঙে দেয়। তাই ঈমান রক্ষার অন্যতম প্রধান শর্ত হলো—উপযুক্ত পরিবেশ

তৈরি করা, সৎ সঙ্গ গ্রহণ করা, এবং সমাজের নেতিবাচক প্রভাব থেকে নিজেকে ও পরিবারকে সুরক্ষিত রাখা। এই উপলব্ধি পরবর্তী অংশে আধুনিক যুগের ঈমানের চ্যালেঞ্জকে আরও গভীরভাবে বুঝার পথ তৈরি করে।

আধুনিক যুগে ঈমানের চ্যালেঞ্জ

আধুনিক যুগ মানব সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে দ্রুতগামী, পরিবর্তনশীল ও জটিল সময়গুলোর একটি। প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, তথ্যপ্রবাহের বিস্ফোরণ, বিশ্বায়ন, সাংস্কৃতিক মিশ্রণ, ভোগবাদী জীবনযাত্রা—এসব বিষয় মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ, মূল্যবোধ এবং বিশ্বাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এই পরিবর্তনের মাঝেই মুসলিম সমাজের সামনে সবচেয়ে বড় যে সংকট এসেছে তা হলো—ঈমানের দুর্বলতা। মানুষ আজ আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় জ্ঞানের অভাব নয়, বরং অতিরিক্ত তথ্যের বিভ্রান্তির কারণে বেশি দুর্বল হয়ে পড়ছে।

কুরআন মানুষকে সতর্ক করে বলেছেন:

“وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ۚ”

— “মানুষের মধ্যে এমনও আছে যারা বলে ‘আমরা ঈমান এনেছি’, কিন্তু আল্লাহর পথে কোন পরীক্ষায় পড়লে তারা মানুষের ফিতনাকে আল্লাহর শাস্তির মতো মনে করে।”

(সূরা আল-আঙ্কাবুত, ২৯:১০)

এ আয়াত আধুনিক যুগের বাস্তবতাকে খুব নিখুঁতভাবে তুলে ধরে: ঈমান মুখে আছে, কিন্তু পরীক্ষার মুহূর্তে দুর্বল হয়ে পড়ে। আজকের যুগে এ অবস্থা আরও প্রকট।

আধুনিক সমাজ যে বিষয়গুলোকে অগ্রগতি বা স্বাধীনতা বলে বিবেচনা করছে, সেগুলোর একটি বড় অংশই আসলে ঈমানের দৃষ্টিতে বিপজ্জনক। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ

হলো বস্তুবাদ (Materialism)। আধুনিক মানুষ মনে করে—জীবনের উদ্দেশ্য শুধুই উপভোগ, আর সফলতা মানে সম্পদ, আরাম ও ভোগলালসা। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামের মূল আকীদার সাথে সরাসরি বিরোধী। কুরআনে আল্লাহ তাআলা সতর্ক করে বলেন:

“أَلْهَأَكُمُ التَّكَاثُرُ ۚ”

— “বহুল প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে।”

(সূরা আত-তাকাসুর, ১০২:১)

বস্তুবাদ হৃদয়কে গাফেল করে এবং ধীরে ধীরে ঈমানকে দুর্বল করে দেয়।

আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো নাস্তিক্যবাদ (Atheism) ও সংশয়বাদ। ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নাস্তিক ও ধর্মবিরোধী মতাদর্শ তরুণদের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। দুর্বল ঈমানসম্পন্ন মানুষ এসব সন্দেহ, প্রশ্ন ও বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যায় এবং ধীরে ধীরে ঈমান বলেছেন: ۞নষ্ট হয়ে যায়। রাসূল

“يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَشْكُونَ فِيهِ فِي اللَّهِ”

— “এক সময় এমন আসবে যখন মানুষ আল্লাহ সম্পর্কে সন্দেহে পড়ে যাবে।”

(তাবারানি, আল-মুজাম আল-কাবীর, হাদিস ১২২৪৭)

এই ভবিষ্যদ্বাণী আজ হুবহু বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম আধুনিক যুগের ঈমানের সবচেয়ে বড় পরীক্ষাগুলোর একটি। এর মাধ্যমে অশ্লীলতা, পাপ, মিথ্যা তথ্য, বিকৃত চিন্তাধারা, অহংকার, রিয়া, সময় নষ্ট—এসব ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। কুরআনে আল্লাহ বলেন:

“إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُونًا”

— “শ্রবণ, দৃষ্টি এবং হৃদয়—এসবের প্রতিটির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে।”

(সূরা আল-ইসরা, ১৭:৩৬)

সোশ্যাল মিডিয়া মানুষের দৃষ্টি ও হৃদয়কে এমনভাবে আক্রান্ত করে যে ঈমান ধীরে ধীরে নিভে যেতে থাকে।

আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো পশ্চিমা সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ। অনেক মুসলিম মনে করে পশ্চিমা সমাজের জীবনধারা, মূল্যবোধ ও স্বাধীনতাই উন্নতির চাবিকাঠি। অথচ এসব চিন্তা সতর্ক করে বলেছেন: ﷺ ঈমানের মূল ধারণাকে ক্ষুণ্ণ করে। রাসূল

“لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ”

— “তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির পথ অনুসরণ করবে।”

(সহীহ বুখারী, হাদিস ৭৩২০)

এ হাদিস আজকের যুগে সম্পূর্ণ বাস্তব।

ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism), উদারতাবাদ (Liberalism), মানবতাবাদ (Humanism), ফেমিনিজম এবং বিভিন্ন পাশ্চাত্য চিন্তাধারা এমনভাবে প্রচারিত হচ্ছে যে তরুণ প্রজন্ম ইসলামকে কেবল একটি সংস্কৃতি বা ঐতিহ্য হিসেবে দেখে, কিন্তু জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করতে সংকোচবোধ করে। এগুলো ঈমানকে ধীরে ধীরে নিস্তেজ করে দেয়।

পরিবারভিত্তিক ঈমানী পরিবেশের অভাবও একটি বড় সমস্যা। অনেক পরিবারের ভেতর ইবাদতের পরিবেশ নেই, ধর্মীয় আলোচনা নেই, আল্লাহভীতি নেই। ফলে শিশু-কিশোরেরা ঈমানী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয় এবং বড় হয়ে দুর্বল ঈমানের মানুষে পরিণত হয়।

সমাজে অশ্লীলতা, সুদের প্রসার, হারাম আয়ের সহজলভ্যতা, অসৎ কাজের প্রতি উৎসাহ—

এসবও ঈমানকে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কুরআনে আল্লাহ বলেন:

“وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ”

— “ব্যভিচারের কাছেও যেও না।”

(সূরা আল-ইসরা, ১৭:৩২)

আধুনিক যুগে ব্যভিচারের উপাদান মানুষের জীবনযাত্রায় ঢুকে পড়েছে—চোখের সামনে, ডিভাইসে, বিনোদনে—যা ঈমানকে গুরুতরভাবে আঘাত করে।

সমগ্র চিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—আধুনিক যুগ ঈমানের জন্য বৈরী পরিবেশ। মানুষের অন্তরকে বিভ্রান্ত করার মতো উপাদান প্রতিটি মুহূর্তে উপস্থিত। তাই আজকের মুসলিমকে আগের যেকোনো যুগের তুলনায় বেশি সচেতন, দৃঢ় ও জ্ঞানী হতে হয়। ঈমানকে ধরে রাখতে হলে শক্ত পরিবেশ, সঠিক জ্ঞান, নেক সঙ্গ এবং আল্লাহর নৈকট্য—সবই প্রয়োজন। এই বাস্তবতা উপলব্ধি করলে বোঝা যায়, আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ শুধু বুদ্ধিবৃত্তিক নয়, বরং আধ্যাত্মিক ও সামাজিকও। আর তাই ঈমান রক্ষা ও পুনরুজ্জীবনের পথ—নির্দেশনা পরবর্তী আলোচনায় আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

শিরক-কুফরের আধুনিক রূপ

ইসলামে শিরক ও কুফর এমন দুটি অপরাধ, যা মানুষের ঈমানকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেয় এবং আল্লাহর নৈকট্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। অতীতে যেমন শিরক ও কুফর ছিল প্রকাশ্য ও স্পষ্ট—মূর্তি পূজা, দেবদেবীর উপাসনা, আল্লাহর বিধান অস্বীকার করা—আধুনিক যুগে সেগুলোর রূপ অনেক জটিল, আড়াল করা এবং মানসিক-সাংস্কৃতিক আঙ্গিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই আজকের মুসলিমের দায়িত্ব হলো—শিরক ও কুফরের আধুনিক রূপগুলো চিনে ঈমানকে রক্ষা করা। কুরআনে আল্লাহ তাআলা সতর্ক করে বলেছেন:

“وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا”

— “তোমরা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকেও অংশীদার করো না।”

(সূরা আন-নিসা, ৪:৩৬)

শিরক ও কুফরের নিষেধাজ্ঞা চিরস্থায়ী। যুগ বদলালেও মানুষের ভ্রান্তি বদলায়নি, শুধু রূপ বদলেছে।

আধুনিক যুগের বড় পরীক্ষাগুলোর একটি হলো মানব-পূজা বা ব্যক্তিত্ব-পূজা। অনেকে রাজনীতিবিদ, অভিনেতা, খেলোয়াড় বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের এত বেশি সম্মান ও আনুগত্য দেখায় যে তাদের কথাই সত্য মনে করে, এমনকি ধর্মের চেয়েও তাদের সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দেয়। কুরআনে আল্লাহ বলেন:

“اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ”

— “তারা তাদের আলেম ও সাধুদেরকে আল্লাহকে ছেড়ে প্রভু বানিয়ে নিয়েছিল।”

(সূরা আত-তাওবা, ৯:৩১)

ইবনে কাসীর ব্যাখ্যায় লিখেছেন—তারা আলেমদের হালাল-হারাম বানানোকে মেনে নিত, যা আসলে শিরক।

(তাফসির ইবনে কাসীর, ২/৪০৮)

আজ অনেক মানুষ সোশ্যাল মিডিয়া তারকাদের মতামতকে এমনভাবে অনুসরণ করছে, যা এই আয়াতের বাস্তব রূপ।

আরেকটি আধুনিক শিরক হলো রাশিফল, জ্যোতিষ, ভাগ্য গণনা ইত্যাদি। অনেক মানুষ তারা দেখে ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে বিশ্বাস করে বা জ্যোতিষীর কাছে সমাধান খোঁজে—এগুলো

বলেন: ﷺ সরাসরি শিরক। রাসূল

“ مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ”

— “যে ব্যক্তি কোনো জ্যোতিষী বা ভবিষ্যৎ-বক্তার কাছে গিয়ে তার কথায় বিশ্বাস করবে, সে মুহাম্মদের উপর নাজিলকৃত ওয়াহীর সাথে কুফরি করল।”

(সুনান আবু দাউদ, হাদিস ৩৯০৪)

এই হাদিস আজকের যুগে বিশেষভাবে প্রযোজ্য—কারণ রাশিফল, তারামণ্ডল, ‘লাকি নাম্বার’—এসব ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

তন্ত্র-মন্ত্র, তাবিজ, ঝাড়-ফুক—আধুনিক শিরকের আরেক রূপ। অনেক মুসলিম এখনো বিশ্বাস করে যে কোনো ব্যক্তি, পীর, কবির বা তাবিজ তাদের রক্ষা করতে পারে। অথচ

আল্লাহ বলেন:

“ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ”

— “আল্লাহ যদি তোমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন, তবে তিনিই তা দূর করতে পারেন।”

(সূরা আল-আন‘আম, ৬:১৭)

রক্ষার ক্ষমতা কেবল আল্লাহর। তাবিজ বা পীরের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরতা শিরকের সূক্ষ্ম রূপ।

নিউ এজ স্পিরিচুয়ালিজম, শক্তি-চর্চা, “ইউনিভার্স আমার জন্য ব্যবস্থা করবে”—এ ধরনের বিশ্বাসও আধুনিক কুফরি ধারণা। এগুলো আল্লাহকে বাদ দিয়ে ব্রহ্মাণ্ডকে শক্তি হিসেবে ভাবায়, যা ইসলামের তাওহীদ ধারণার বিপরীত।

আরেকটি ভয়ানক আধুনিক কুফর হলো মানবতাবাদ ও উদারবাদ (Secular Humanism)।

এসব মতবাদ বলে—“মানুষের প্রয়োজন যা বলবে, সেটাই ন্যায়-অন্যায় নির্ধারণ করবে।”

অথচ কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:

“ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ”

— “হুকুম কেবল আল্লাহরই।”

(সূরা ইউসুফ, ১২:৪০)

যারা মনে করে মানবিক মূল্যবোধই সর্বোচ্চ, আল্লাহর বিধান নয়—তারা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করছে, যা কুফরির মূল ভিত্তি।

আরেকটি আধুনিক শিরক হলো জীবন-নির্ভরতাকে আল্লাহ থেকে সরিয়ে অন্য কিছু উপর স্থাপন করা, যেমন—

- বিজ্ঞান আমাদের উদ্ধার করবে
- অর্থই সবকিছু
- প্রযুক্তিই সমস্যার সমাধান
- ডাক্তার, রাষ্ট্র বা শক্তিই সর্বোচ্চ ভরসা

এগুলো তখনই শিরকের রূপ নেয় যখন মানুষ বিশ্বাসী হয়ে যায় যে এগুলোর ক্ষমতা আল্লাহ থেকে স্বতন্ত্র। ইসলামে আল্লাহ ছাড়া কাউকেই নির্ভরতার সর্বোচ্চ স্থানে রাখা যায় না।

সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে রিয়া (দেখানো) এক ভয়ানক শিরকে আসগর। মানুষ ইবাদত না বলেছেন:ﷺ করে ছবি তোলে, দান না করে ভিডিও করে—যাতে প্রশংসা পায়। রাসূল

“أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر... الرياء”

— “আমি তোমাদের জন্য সবচেয়ে ভয় পাই ছোট শিরককে... আর তা হলো রিয়া।”

(মুসনদ আহমদ, হাদিস ২৩১১৯)

রিয়া মানুষকে ধীরে ধীরে আন্তরিকতা থেকে বঞ্চিত করে এবং ইবাদতকে মানুষ-নির্ভর করে তোলে।

এ ছাড়াও নতুন যুগের কুফরি ধারণা—যেমন,

- নিয়তির অস্বীকার করা
- সমকামিতাকে বৈধ মনে করা
- ইসলামকে শুধুই সংস্কৃতি বলা
- নারীবাদী মতবাদের কারণে শরীয়ত অস্বীকার করা
- “সকল ধর্ম একই” বলা
 - এগুলোর সবই ঈমানের পরিপন্থী চিন্তা, যা সরাসরি ঈমানের ভিতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

এই বাস্তবতা দেখলে বোঝা যায়—শিরক ও কুফর আজ শুধু মন্দির বা কুফরি মতাদর্শে সীমাবদ্ধ নেই; বরং আধুনিকতা, প্রযুক্তি, সংস্কৃতি, মিডিয়া, দর্শন, এমনকি চিন্তার আড়ালে শিরক ও কুফরের বিভিন্ন ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। সচেতনতা ছাড়া এগুলো থেকে বাঁচা কঠিন।

এ কারণেই ইসলামের প্রকৃত তাওহীদ ধারণা বোঝা এবং আধুনিক ফিতনার উৎস চিহ্নিত করা আজকের দিনের মুসলিমের জন্য অপরিহার্য। এই বিষয়টি বুঝে নিলে স্পষ্ট হয়—যুব সম্প্রদায়ের ঈমান কেন এত দ্রুত দুর্বল হচ্ছে, যা পরবর্তী আলোচনায় আরও পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

যুব সম্প্রদায়ের ঈমান সংকট

আধুনিক যুগে মুসলিম উম্মাহর যেসব সমস্যাগুলো সবচেয়ে উদ্বেগজনক, তার মধ্যে অন্যতম হলো যুব সম্প্রদায়ের ঈমান সংকট। যৌবন বয়স মানুষের জীবনের সবচেয়ে উচ্ছ্বাসপূর্ণ, চ্যালেঞ্জপূর্ণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়। এ বয়সে মানুষ যেমন উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে পারে, ঠিক তেমনই সামান্য ভুল পথে গেলে এমন গভীর গহ্বরে পতিত হতে পারে যা থেকে ফিরে আসা কঠিন হয়ে যায়। তাই ইসলামে যুবকদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:

“إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى”

— “তারা ছিল কিছু তরুণ, যারা তাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান এনেছিল; আর আমরা তাদের সঠিক পথে অটল রেখেছিলাম।”

(সূরা আল-কাহফ, ১৮:১৩)

আশাবাদী ও ঈমানদার তরুণদের উদাহরণ আল্লাহ নিজেই কুরআনে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো—আজকের যুগে তরুণদের ঈমান নানা দিক থেকে আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে।

যুব সমাজের ঈমান সংকটের সবচেয়ে বড় উৎস হলো সন্দেহবাদী চিন্তাধারা ও নাস্তিক্যবাদ।

ইন্টারনেট, ইউটিউব, সোশ্যাল মিডিয়া—এসব মাধ্যমের মাধ্যমে নাস্তিকতা, ধর্মকে উপহাস, কোরআন-হাদিস সম্পর্কে বিকৃত ব্যাখ্যা, সন্দেহ সৃষ্টি—এসব তরুণদের কাছে খুব সহজলভ্য হয়ে গেছে। যে বয়সে ঈমানকে শক্ত করার কথা, সে বয়সে তারা সন্দেহের আঘাতে বিপর্যস্ত

বলেছেন: ﷻ হয়ে পড়ে। রাসূল

“يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ.”

— “একসময় এমন আসবে, যখন ইসলামের কেবল নাম থাকবে।”

(বায়হাকি, শু‘আবুল ঈমান, হাদিস ৮০২৪)

এই সতর্কতা আজকের প্রেক্ষাপটে খুবই বাস্তব মনে হয়—যুবকরা মুসলিম পরিচয় রাখে, কিন্তু ঈমানের প্রকৃত স্বরূপ জানে না।

অশ্লীলতা, পর্নোগ্রাফি, প্রেম-রোমান্স—এগুলোও যুব সমাজের ঈমান সংকটের অন্যতম বড় কারণ। এগুলো চোখ, মন ও হৃদয়কে এমনভাবে দূষিত করে যে ধীরে ধীরে ইবাদতের প্রতি ভালোবাসা হারিয়ে যায়, আল্লাহভীতি কমে যায়, এবং গুনাহকে হালকা মনে হতে থাকে।

কুরআনে সতর্ক করা হয়েছে:
“قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ”

— “মুমিন পুরুষদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে।”
(সূরা আন-নূর, ২৪:৩০)

দৃষ্টি সংযম ঈমান রক্ষার প্রধান উপায় আর আজকের যুগে এ দৃষ্টিই সবচেয়ে বেশি আক্রমণের শিকার।

সমাজ ও পরিবারের ধর্মীয় পরিবেশ দুর্বল হলেও যুবকরা ঈমান হারিয়ে ফেলে। অনেক ঘরে নামাজ নেই, কোরআন তিলাওয়াত নেই, ইসলামি আলোচনা নেই; ফলে তরুণ প্রজন্ম ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে। তাদের মাঝে ঈমানি নরমভাব গড়ে ওঠে না। এমনকি সমাজে নৈতিকতা দুর্বল হওয়াও তাদের ঈমানকে বিপর্যস্ত করে।

অন্যদিকে অতিরিক্ত স্বাধীনতা ও স্বঅহংকার আধুনিক তরুণদের মাঝে একটি মারাত্মক রোগে পরিণত হয়েছে। তারা মনে করে—

“আমার জীবনে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।”
“ধর্ম ব্যক্তিগত, আমার ইচ্ছাই শেষ কথা।”

এই মানসিকতা শয়তানের সেই অহংকারের মতো, যে বলেছিল:
“أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ”

— “আমি তার চেয়ে উত্তম।”
(সূরা আল-আ‘রাফ, ৭:১২)

এ অহংকার ঈমানকে ধ্বংস করে দেয়।

এছাড়া সাফল্যের ভুল ধারণা—উচ্চ বেতন, নাম, খ্যাতি, ক্যারিয়ার, বিলাসী জীবন—এসবকে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য মনে করতে করতে তারা ঈমান, আখিরাত, আল্লাহ—এসবকে পিছনে ফেলে দেয়। অথচ আল্লাহ বলেন:

“وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى”
— “আল্লাহর নিকট যা রয়েছে, তা উত্তম এবং স্থায়ী।”
(সূরা আল-কাসাস, ২৮:৬০)

যুব সমাজ যখন অস্থায়ী দুনিয়ার পেছনে ছুটতে ছুটতে আখিরাত ভুলে যায়, তখন ঈমানের সংকট আরও গভীর হয়।

তরুণদের আরেকটি সংকট হলো নেতিবাচক সঙ্গ। বন্ধুরা যদি গুনাহ, অশ্লীলতা, অবহেলা, বলেন: ۞ ধর্মবিমুখতার দিকে ধাবিত করে, তবে তরুণের ঈমান টিকিয়ে রাখা কঠিন। রাসূল

“المرء على دين خليله”
— “মানুষ তার বন্ধুর ধর্ম-চরিত্র অনুসরণ করে।”
(আবু দাউদ, হাদিস ৪৮৩৩)

আজকের তরুণদের অনেকেই এমন বন্ধুদের মাঝে থাকে যারা ঈমান শক্ত করার বদলে ঈমান দুর্বল করে।

সামগ্রিকভাবে দেখা যায়—যুব সমাজের ঈমান সংকট কেবল জ্ঞানের অভাবে নয়; বরং পরিবেশ, প্রযুক্তি, সংস্কৃতি, ভুল সঙ্গ, পরিবার, সমাজ, এবং বৈরী মতাদর্শের সম্মিলিত প্রভাব। তাদের সামনে পথ খোলা, কিন্তু দিকনির্দেশনা কম; সুযোগ বেশি, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ কম; প্রলোভন বেশি, কিন্তু আত্মিক শক্তি দুর্বল।

এ কারণে যুবকদের ঈমান রক্ষার জন্য প্রয়োজন—সঠিক আকিদার জ্ঞান, ধর্মীয় পরিবেশ, উত্তম সঙ্গ, নৈতিক প্রশিক্ষণ, ইবাদতের ধারাবাহিকতা এবং আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক। এগুলো যত শক্তিশালী হবে, ততই আধুনিক ফিতনার মোকাবিলা করা সম্ভব হবে, যা পরবর্তী আলোচনায় ঈমান রক্ষা ও পুনরুজ্জীবনের পথকে আরও ব্যাপকভাবে পরিষ্কার করবে।

ঈমান রক্ষার উপায়

ঈমান মানুষের জীবনের এমন এক সম্পদ, যার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই সুন্দর হয়। কিন্তু ঈমান স্থায়ী নয়—এটি বাড়ে, কমে, শক্তিশালী হয়, আবার দুর্বলও হয়ে পড়ে। তাই ঈমান রক্ষার জন্য সচেতন প্রচেষ্টা আবশ্যিক। ইসলাম মানুষের অন্তরকে সুরক্ষিত রাখার জন্য বিভিন্ন উপায় নির্দেশ করেছে, যা অনুসরণ করলে ঈমান স্থায়ীভাবে শক্তিশালী থাকে এবং গুনাহ, ফিতনা ও সন্দেহের আঘাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

“يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ”

— “আল্লাহ ঈমানদারদেরকে দৃঢ় বাক্যের মাধ্যমে দৃঢ় রাখেন।”

(সূরা ইবরাহিম, ১৪:২৭)

এই আয়াত ঈমানকে স্থায়ী করার উপায় সম্পর্কে আশার দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

ঈমান রক্ষার প্রথম ও প্রধান মাধ্যম হলো শরীয়তসম্মত জ্ঞান অর্জন করা। সঠিক জ্ঞান মানুষকে শিরক, কুফর, বিদআত, বড় গুনাহ ও সন্দেহের পথ থেকে দূরে রাখে। কুরআনে

আল্লাহ বলেন:

“فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ”

— “জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।”

(সূরা মুহাম্মদ, ৪৭:১৯)

ইমাম বুখারি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন—জ্ঞানই ঈমানের প্রথম ধাপ। (সহীহ বুখারি, কিতাবুল ইলম)

যে ব্যক্তি কোরআন-হাদিস ও আকীদার মৌলিক বিষয় শিখে, তার ঈমান সন্দেহ ও ভ্রান্তি থেকে সুরক্ষিত হয়। তাই নিয়মিত কোরআন পড়া, তার তাফসির অধ্যয়ন করা এবং বিশ্বস্ত আলিমদের কাছ থেকে দ্বীনের জ্ঞান গ্রহণ করা ঈমান রক্ষার অন্যতম প্রধান উপায়।

ঈমান শক্ত করার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো নামাজ ও ইবাদতে স্থিরতা। নামাজ হলো

ঈমানের প্রমাণ, আলো এবং আসল শক্তির উৎস। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

“إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ”

— “নামাজ অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।”

(সূরা আল-আনকাবুত, ২৯:৪৫)

নামাজ শুধু একটি আচার নয়; বরং এটি প্রতি মুহূর্তে ঈমানকে পুনর্নবীকরণ করে। যারা নামাজে গাফিল থাকে, তারা ধীরে ধীরে ঈমান দুর্বল হতে থাকায় বিভিন্ন গুনাহ ও প্রলোভনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তাছাড়া রোজা, যাকাত, রাতের ইবাদত, দো‘আ—এসব ইবাদত ঈমানের জন্য ভেতর থেকে একটি শক্তিশালী সাপোর্ট সিস্টেম তৈরি করে।

ঈমান রক্ষায় চারপাশের পরিবেশ বড় ভূমিকা রাখে। সৎ বন্ধু, নেক সঙ্গ এবং ধার্মিক বলেছেন: ﷺ পরিবেশ ঈমানকে স্থায়ী করে। রাসূল

“المرء على دين خليله”

— “মানুষ তার বন্ধুর ধর্ম-চরিত্র অনুসরণ করে।”

(আবু দাউদ, হাদিস ৪৮৩৩)

যে পরিবেশে নামাজ, কোরআন, পরহেজগারি, সত্যবাদিতা আছে—সে পরিবেশে ঈমান বৃদ্ধি পায়। বিপরীতে, যেখানে অশ্লীলতা, মন্দ কাজ, সন্দেহ ছড়ানো মতাদর্শ আছে—সেখানে ঈমান দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই সঙ্গ বাছাই করা ঈমান রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

ঈমানকে সুরক্ষিত রাখতে গুনাহ পরিত্যাগ অপরিহার্য। গুনাহ অন্তরকে অন্ধকার করে এবং

বলেছেন: ﷺ ধীরে ধীরে ঈমানের আলো নিভিয়ে দেয়। রাসূল

“إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا نُكَّتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ”

— “এক ব্যক্তি যখন গুনাহ করে, তার হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়তে থাকে।”

(সুনান তিরমিজি, হাদিস ৩৩৩৪)

গুনাহ যত বাড়ে, দাগ তত বাড়ে। তাই গুনাহ থেকে বাঁচা এবং গুনাহ হয়ে গেলে সাথে সাথে তাওবা করা ঈমানকে পরিষ্কার ও শক্ত রাখে। তাওবা মানুষের অন্তরকে পুনর্জীবিত করে, আল্লাহর নৈকট্য এনে দেয়, এবং ভেতরের অশুদ্ধতা দূর করে।

ঈমান রক্ষার জন্য আল্লাহর উপর নির্ভরতা (তাওয়াক্কুল) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যারা আল্লাহর উপর নির্ভর করে, তারা দুনিয়ার ভয়, দুশ্চিন্তা ও চাপ থেকে মুক্ত থাকে এবং তাদের ঈমান

স্থির হয়। আল্লাহ বলেন:

“وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ”

— “তোমরা যদি মুমিন হও, তবে আল্লাহর ওপর ভরসা করো।”

(সূরা আল-মায়দাহ, ৫:২৩)

আল্লাহর উপর নির্ভরতা মানুষকে স্থিরতা, সাহস ও মনোবল দেয়—যা ঈমান রক্ষার জন্য অপরিহার্য।

আখিরাতের কথা স্মরণ করা ঈমানকে শক্ত রাখার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। আজকের যুগে দুনিয়ার মোহ মানুষের হৃদয়কে এতটাই দখল করে নেয় যে আখিরাত ভুলে যায়, ফলে ঈমান দুর্বল হয়। কুরআনে আল্লাহ বলেন:

“وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ”

— “আর তারা আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।”

(সূরা আল-বাকারাহ, ২:৪)

আখিরাতের চিন্তা মানুষকে গুনাহ থেকে বিরত রাখে, ইবাদতের প্রতি আগ্রহী করে এবং জীবনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে।

ঈমান রক্ষার আরেকটি পথ হলো নিয়মিত আত্মসমালোচনা (মুহাসাবা)। হযরত উমর (রাঃ) বলেছেন:

“নিজেকে হিসাব নাও, হিসাব নেয়ার আগে।”

(হিলইয়াতুল আওলিয়া, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯৫)

আত্মসমালোচনা মানুষকে সচেতন রাখে যে তার ঈমান কোথায় দুর্বল হচ্ছে, কোথায় উন্নতির প্রয়োজন।

সবশেষে, কুরআনের সাথে গভীর সম্পর্ক ঈমানকে এমনভাবে শক্ত করে যে হৃদয় অন্য কোনো দিকে ঝুঁকতে পারে না। কুরআন হলো ঈমানের আলো, দিশা ও চিকিৎসা। আল্লাহ বলেন:

“هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ”

— “এটি মুতাক্কীদের জন্য হিদায়াত।”

(সূরা আল-বাকারাহ, ২:২)

যে ব্যক্তি নিয়মিত কোরআন পড়ে, বুঝে, চিন্তা করে—তার ঈমান স্থায়ীভাবে শক্তিশালী হয়। সার্বিকভাবে বলা যায়—ঈমান রক্ষার উপায় বহুমাত্রিক, এবং প্রতিটি উপায় হৃদয়কে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনে। জ্ঞান, ইবাদত, নেক পরিবেশ, গুনাহ থেকে দূরে থাকা, তাওবা, তাওয়াক্কুল ও কুরআনের সাথে সংযুক্ত থাকা—এসব মিলেই একজন মানুষের ঈমান স্থিতিশীল হয়। এই আলোচনার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রাসঙ্গিক হয়ে আসে ঈমান দুর্বল হওয়ার লক্ষণগুলো চিহ্নিত করা, যাতে মানুষ আগে থেকেই সতর্ক হতে পারে।

ঈমান দুর্বল হওয়ার লক্ষণসমূহ

ঈমান মানুষের হৃদয়ে এমনভাবে স্থাপন করা হয় যে তা তার আচরণ, চরিত্র, দৃষ্টিভঙ্গি ও সিদ্ধান্তগুলোর উপর প্রভাব ফেলে। ঈমানের আলো শক্তিশালী হলে মানুষ নেক আমল, সততা, পরহেজগারি ও আল্লাহভীতির পথে থাকে; আর ঈমান দুর্বল হলে গুনাহ, অবহেলা, উদাসীনতা ও আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার পথ তৈরি হয়। ইসলাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে ঈমান বৃদ্ধি-হ্রাসশীল, এবং দুর্বল হওয়ার নির্দিষ্ট কিছু লক্ষণ রয়েছে, যা চিহ্নিত করতে পারলে মানুষ সময়মতো নিজেকে সংশোধন করতে পারে। রাসূল ﷺ বলেছেন:

“إِنَّ الْإِيمَانَ لِيَخْلُقُ فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلُقُ الثَّوْبُ، فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَنْ يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ”

— “তোমাদের কারও হৃদয়ে ঈমান পুরনো কাপড়ের মতো জীর্ণ হয়ে যায়। তাই আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করো, তিনি যেন তোমাদের ঈমান পুনর্নবীকরণ করে দেন।”

(মুসনাদ আহমদ, হাদিস ২১৪০০)

এই হাদিস প্রমাণ করে—ঈমান কমে, দুর্বল হয়, এবং তা পুনরায় শক্ত করার প্রয়োজন হয়।

ঈমান দুর্বল হওয়ার প্রথম লক্ষণ হলো ইবাদতের প্রতি অনাগ্রহ ও অলসতা। যখন হৃদয় আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরে যায়, তখন নামাজ ভারী হয়ে ওঠে, কোরআন পড়তে মন চায় না, দো‘আ করা কষ্টকর মনে হয়। আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেছেন:

“وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى”

— “তারা যখন নামাজের জন্য দাঁড়ায়, তখন অলসভাবে দাঁড়ায়।”

(সূরা আন-নিসা, ৪:১৪২)

যে অবস্থাটি মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই একই অবস্থা যখন মুমিনের মাঝে দেখা দেয়, তখন তা ঈমান দুর্বল হওয়ার স্পষ্ট আলামত।

ঈমান দুর্বল হওয়ার আরেকটি বড় লক্ষণ হলো গুনাহকে হালকা মনে করা। মানুষ যখন গুনাহ করতে করতে হৃদয় শক্ত হয়ে যায়, তখন বড় গুনাহও আর ভারী মনে হয় না। অথচ সাহাবারা ছোট গুনাহকেও এমন ভয় পেতেন যেন তা কোনো পাহাড় তাদের উপর ভেঙে পড়তে যাচ্ছে। ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন:

“মুনাফিক তার গুনাহকে মনে করে একটি মাছির মতো, যা নাকের সামনে উড়ে এসে বসেছে; আর সে হাত দিয়ে তা সরিয়ে দেয়। কিন্তু মুমিন তার গুনাহকে মনে করে একটি পাহাড়ের মতো, যা তার উপর পড়ে যাবে।”

(সহীহ বুখারি, হাদিস ৫৯৪৯)

যখন গুনাহ স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয় এবং অনুতাপ না থাকে—এটি ঈমানের দুর্বলতার বড় নিদর্শন।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হলো আল্লাহর ভয় কমে যাওয়া এবং আখিরাতের চিন্তা দুর্বল হওয়া। কুরআনে আল্লাহ বলেন:

“ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ”

— “তারা কি আল্লাহর শাস্তি থেকে নিরাপদ মনে করছে?”

(সূরা ইউসুফ, ১২:১০৭)

যখন আল্লাহর শাস্তির ভয় হৃদয় থেকে দূর হতে থাকে, তখন মানুষ গুনাহকে সহজ করে নেয়, আমল অবহেলা করতে থাকে, আর আখিরাতের স্মরণ ম্লান হয়ে যায়।

ঈমান দুর্বল হওয়ার লক্ষণের মধ্যে একটি হলো দুনিয়ার প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক। দুনিয়ার মোহ এমনভাবে মানুষকে গ্রাস করে যে আল্লাহর স্মরণ, নামাজ, নেক আমল—এসব গৌণ হয়ে পড়ে। কুরআনে সতর্ক করে বলা হয়েছে:

“ رَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأْنَنُوا بِهَا ”

— “তারা দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হয়ে পড়ে এবং এটিতেই নিশ্চিত হয়ে যায়।”

(সূরা ইউনুস, ১০:৭)

যখন দুনিয়ার স্বপ্ন, ভোগলালসা ও সম্পদ আল্লাহর স্মরণকে পেছনে ঠেলে দেয়—তখন হৃদয়ের ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ছে।

আরেকটি লক্ষণ হলো গুনাহ করার পর অনুতাপ না থাকা। গুনাহ হলে যদি হৃদয় ভারী না হয়, গুনাহকরতা যদি লজ্জিত না হয়, তবে এটি ঈমানের দুর্বলতার পরিচয়। আল্লাহ বলেন:

“ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ”

— “তওবা তাদের জন্য যাদের ভুল হয়ে যায় এবং পরে দ্রুত তারা তওবা করে।”

(সূরা আন-নিসা, ৪:১৭)

তওবার অনুভূতি না থাকা মানে গুনাহের ভয় না থাকা, যা হৃদয়ের কঠোরতার আলামত।

ঈমান দুর্বল হওয়ার আরেকটি পরিচায়ক হলো গোপনে গুনাহ বৃদ্ধি পাওয়া। মানুষ যখন জনসমক্ষে নেক দেখায় কিন্তু একা থাকলে সহজেই হারাম কাজে লিপ্ত হয়, তখন তা

বলেছেন: ۞ অভ্যন্তরীণ ঈমানের দুর্বলতা নির্দেশ করে। রাসূল

“ لَاَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ... ”

তিনি বলেন, তারা রাতে গোপনে হারাম কাজ করত।

(ইবনে মাজাহ, হাদিস ৩৯৮৯)

গোপন অবস্থায় পাপের বৃদ্ধি হলো অন্তরের দুর্বলতার প্রতিফলন।

ঈমান দুর্বল হওয়ার আরেকটি চিহ্ন হলো কুরআন থেকে দূরত্ব ও স্মরণে উদাসীনতা। যখন কুরআন পড়তে মন চায় না, বুঝতে আশ্রয় থাকে না বা কুরআনের নির্দেশে পরিবর্তন

আসতে দেখা যায় না—তখন ঈমান দুর্বল হচ্ছে। আল্লাহ বলেন:

“ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ”

— “তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা করে না?”

(সূরা আন-নিসা, ৪:৮২)

যে হৃদয় কুরআন থেকে দূরে সরে যায়, তা স্বাভাবিকভাবেই ঈমানহীন হয়ে পড়ে।

ঈমান দুর্বল হওয়ার আরেকটি লক্ষণ হলো গুনাহভরা পরিবেশে স্বচ্ছন্দ থাকা। অশ্লীলতা, গিবত, মিথ্যা, ব্যঙ্গ-বিদ্রোপে ভরা পরিবেশে থাকলে যদি অপরাধবোধ না হয়, তবে তা ঈমানের দুর্বলতা প্রমাণ করে। কারণ জীবন্ত ঈমান সবসময় মন্দ থেকে অস্বস্তি অনুভব করে।

অন্তরের নরমভাব (খুশী) কমে যাওয়া, ইবাদতে মনোযোগ না থাকা, দো‘আতে অগাধ বিশ্বাস না রাখা—এসবও দুর্বল ঈমানের লক্ষণ। যখন মানুষ দো‘আকে আনুষ্ঠানিক মনে করে, বা আল্লাহর সাহায্য পাওয়াকে নিছক সম্ভাবনার মতো মনে করে, তখন তাকে বুঝতে হবে—তার ঈমান দুর্বল হচ্ছে।

সমগ্র বিবেচনায় দেখা যায়—ঈমান দুর্বল হওয়া একদিনে ঘটে না; বরং ধীরে ধীরে, ছোট ছোট লক্ষণের মাধ্যমে ঘটে। এসব লক্ষণ সচেতনভাবে চিহ্নিত করলে মানুষ তার ঈমানকে পুনরায় শক্ত করার সুযোগ পায়। আর এ উপলব্ধি পরবর্তী অংশে উপসংহারের মাধ্যমে থিসিসের সার্বিক বিষয়গুলোকে আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে সহায়তা করবে।

ঈমান শক্তিশালী হওয়ার লক্ষণসমূহ

ঈমান এমন একটি আধ্যাত্মিক শক্তি যা মানুষের অন্তর, চিন্তা ও আচরণকে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে পরিচালিত করে। যেমন ঈমান দুর্বল হওয়ার কিছু নির্দিষ্ট লক্ষণ আছে, তেমনি ঈমান শক্তিশালী হওয়ারও সুস্পষ্ট লক্ষণ রয়েছে, যা একজন মুমিনকে অন্যদের থেকে আলাদা করে। কুরআন ও হাদিসে শক্তিশালী ঈমানের যে বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো একজন মুমিনের অন্তর, চরিত্র ও জীবনে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

“إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ”

— “মুমিন তো তারা, যখন আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়, তাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে; আর যখন তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।”

(সূরা আল-আনফাল, ৮:২)

এই আয়াতে ঈমান শক্তিশালী হওয়ার তিনটি বড় লক্ষণ উল্লেখ করা হয়েছে:

- ১) আল্লাহর স্মরণে হৃদয়ের নরম হওয়া
- ২) কোরআনের আয়াত শুনে ঈমান বৃদ্ধি পাওয়া
- ৩) আল্লাহর উপর নির্ভরতা

এগুলোকে কেন্দ্র করে শক্তিশালী ঈমানের বৈশিষ্ট্যগুলো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ঈমান শক্তিশালী হওয়ার প্রথম লক্ষণ হলো ইবাদতে আন্তরিকতা ও আনন্দ পাওয়া। একজন ঈমানদার যখন নামাজ পড়ে, দোআ করে, কোরআন তিলাওয়াত করে—তার অন্তর প্রশান্ত বলেছেন: ﷺ হয়, মন শান্ত হয়, এবং ইবাদতে আনন্দ অনুভব করে। রাসূল
 “ جُعِلَتْ فُرَّةٌ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ ”

— “আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে নামাজে।”

(সুনান নাসাই, হাদিস ৩৯৪০)

যার ঈমান শক্তিশালী, ইবাদত তার কাছে দায়িত্ব নয়; বরং হৃদয়ের চাহিদা।

ঈমান শক্তিশালী হওয়ার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো গুনাহ থেকে দ্রুত ফিরে আসা এবং তওবায় আগ্রহী হওয়া। যখন কোনো মুমিনের ঈমান শক্তিশালী হয়, সে গুনাহ করে সঙ্গে সঙ্গে অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহর কাছে ফিরে আসে। আল্লাহ বলেন:

“ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ”

— “নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন।”

(সূরা আল-বাকারা, ২:২২২)

যার ঈমান দৃঢ়, সে গুনাহকে সহজ মনে করে না; বরং সামান্য ভুলেও তার হৃদয় অস্থির হয়। ইমাম হাসান আল-বাসরী (রহ.) বলেন:

“মুমিন গুনাহকে মনে করে একটি পাহাড়ের মতো যা তার উপর পড়বে।”

(সহীহ বুখারি, হাদিস ৫৯৪৯)

এই অনুভূতিই শক্তিশালী ঈমানের প্রমাণ।

শক্তিশালী ঈমানের আরেকটি লক্ষণ হলো দুনিয়ার প্রতি অতিরিক্ত আসক্ত না থাকা এবং আখিরাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া। একজন মুমিন জানে দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী এবং আখিরাতই স্থায়ী। কুরআনে বলা হয়েছে:

“ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ”

— “আখিরাত উত্তম ও স্থায়ী।”

(সূরা আল-আ'লা, ৮৭:১৭)

যার ঈমান শক্তিশালী, সে সব ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টিতে অগ্রাধিকার দেয়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হলো নৈতিকতা, চরিত্র ও আচরণে পরিবর্তন আসা। সত্যবাদিতা, বলেছেন: ﷺ আমানতদারি, বিনয়, ধৈর্য, দয়া—এসব গুণ শক্তিশালী ঈমানের ফল। রাসূল

“ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ”

— “মুমিনদের মধ্যে ঈমানের দিক থেকে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি যার চরিত্র সর্বোত্তম।”

(সুনান তিরমিজি, হাদিস ১১৬২)

অর্থাৎ চরিত্র উন্নয়নই প্রমাণ করে ঈমানের দৃঢ়তা।

ঈমান শক্তিশালী হওয়ার আরেকটি লক্ষণ হলো শরীয়তের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য ও আল্লাহর হুকুম মানতে আগ্রহ। কুরআনে আল্লাহ বলেন:

“ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ”

— “আমরা শুনলাম এবং মান্য করলাম।”

(সূরা আল-বাকারা, ২:২৮৫)

যার ঈমান শক্তিশালী, সে আল্লাহর আদেশকে প্রশ্নবিদ্ধ করে না; বরং আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ
আস্থা রেখে তা পালন করে।

শক্তিশালী ঈমানের আরেকটি নিদর্শন হলো নেক কাজের প্রতি ধারাবাহিকতা। ছোট আমলও
বলেছেন: ﷺ যদি নিয়মিত হয়, তা ঈমানকে দৃঢ় করে। রাসূল

“ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ ”

— “আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো যে আমলটি নিয়মিত করা হয়, যদিও তা
কম।”

(সহীহ বুখারী, হাদিস ৬৪৬৪)

যে ব্যক্তি নিয়মিত নেক আমল করে, তার ঈমান অব্যাহতভাবে বাড়তে থাকে।

ঈমান শক্তিশালী হওয়ার আরেকটি লক্ষণ হলো আল্লাহর স্মরণে হৃদয় নরম হয়ে যাওয়া।

কোরআনের আয়াত পড়লে তার হৃদয় কেঁপে ওঠে, চোখে পানি আসে, গুনাহ থেকে দূরে

থাকার অনুপ্রেরণা জন্মায়। আল্লাহ বলেন:

“ وَتَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ”

— “যারা তাদের রবকে ভয় করে, তাদের দেহে কাঁটা দেয়।”

(সূরা আজ-জুমার, ৩৯:২৩)

যার হৃদয় আল্লাহর স্মরণে জাগ্রত থাকে, তার ঈমানও জাগ্রত থাকে।

একজন ঈমানদারের হৃদয়ে তাওয়াক্কুল এবং আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা থাকে। তাকে

দুনিয়া ভয় দেখাতে পারে না, কারণ সে জানে—

“ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ”

— “আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট; তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।”

(সূরা আলে-ইমরান, ৩:১৭৩)

এই নির্ভরতা দুর্বল ঈমানের নয়, বরং দৃঢ় ঈমানের পরিচায়ক।

সার্বিকভাবে, ঈমান শক্তিশালী হওয়ার লক্ষণগুলো মানুষের হৃদয়, আচরণ, ইবাদত, সিদ্ধান্ত ও

উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়। এসব লক্ষণ দেখা দিলে বোঝা যায়—ঈমান জীবন্ত,

সক্রিয় এবং আল্লাহর হিদায়াতে আলোকিত। এই আলোচনার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন

উঠে—ঈমানকে শক্তিশালী রাখতে তাকওয়ার ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, যা পরবর্তী অংশে

আরও সুস্পষ্ট হবে।

ঈমানের উপর তাকওয়ার ভূমিকা

ইসলামী আকীদায় তাকওয়া এমন একটি গুণ, যা শুধু ঈমানকে রক্ষা করে না; বরং ঈমানকে বাড়ায়, শক্তিশালী করে এবং জীবনকে আল্লাহর আনুগত্যের পথে পরিচালিত করে। তাকওয়া বলতে বোঝায়—আল্লাহর ভয়, তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, এবং তাঁর আদেশ পালনে আন্তরিক সতর্কতা। এমন হৃদয় যা সবসময় ভাবতে থাকে—“আল্লাহ আমাকে দেখছেন”—সেই হৃদয়ই তাকওয়াবান। আর এমন হৃদয়ই শক্তিশালী ঈমানের প্রকৃত ভিত্তি। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ”

— “হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তাঁর ভয় করার যথাযথ হক অনুযায়ী।”

(সূরা আলে-ইমরান, ৩:১০২)

এই আয়াত প্রমাণ করে যে ঈমানদার হওয়া এবং তাকওয়াবান হওয়া একে অপরের পরিপূরক।

তাকওয়া ঈমানকে রক্ষা করার সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। যখন মানুষের অন্তরে আল্লাহভীতি থাকে, তখন সে গুনাহের কাছে যেতে ভয় পায়। দুনিয়ার প্রলোভন তাকে আকর্ষণ করতে পারে, কিন্তু তাকওয়া তাকে থামিয়ে দেয়। কুরআনে আল্লাহ বলেন:

“وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا”

— “যে আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার জন্য বের হওয়ার পথ তৈরি করে দেবেন।”

(সূরা আত-তালাক, ৬৫:২)

এ আয়াত প্রমাণ করে তাকওয়া শুধু আধ্যাত্মিক গুণই নয়; বরং এটি ঈমানদারকে জীবনের ঝুঁকি, পরীক্ষা ও বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে।

শক্তিশালী ঈমানের মানুষ যখন তাকওয়াবান হয়, তখন সে গোপনে ও প্রকাশ্যে একই রকম থাকে। তাকওয়া মানুষের ভেতরের ঈমানকে এমনভাবে পরিচ্ছন্ন রাখে যে সে গোপনে গুনাহ বলেছেন: ﷻ করতে সংকুচিত হয়। রাসূল

“اتقِ الله حيثما كنت”

— “তুমি যেখানে থাকো, আল্লাহকে ভয় করো।”

(সুনান তিরমিজি, হাদিস ১৯৮৭)

এই নির্দেশ প্রকৃত তাকওয়ার সারমর্ম—এটি শুধুই বাহ্যিক আচরণ নয়; বরং অন্তরের স্বচ্ছতা।

তাকওয়া ঈমানকে বৃদ্ধি করে। কুরআনে বলা হয়েছে:

“قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا”

— “সফল সে ব্যক্তি, যে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে।”

(সূরা আশ-শামস, ৯১:৯)

আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার প্রধান উপায় তাকওয়া। গুনাহ আত্মাকে নোংরা করে দেয়, আর তাকওয়া তা পরিষ্কার করে। যখন আত্মা পরিষ্কার থাকে, তখন ঈমান আলোকিত হয়, কার্যকর হয়, এবং গুনাহের প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে।

তাকওয়া মানুষের সিদ্ধান্ত, অভ্যাস এবং জীবনদৃষ্টিকে পরিবর্তন করে দেয়। যে ব্যক্তি তাকওয়াবান, সে হালাল-হারামের সীমা অতিক্রম করে না, সন্দেহজনক বিষয় এড়িয়ে চলে, বলেছেন: ﷺ এবং সবসময় আল্লাহর সন্তুষ্টিতে অগ্রাধিকার দেয়। রাসূল

“دع ما يريبك إلى ما لا يريبك”

— “যা সন্দেহজনক তা ছেড়ে দাও, যা সন্দেহহীন তাই গ্রহণ করো।”

(সুনান তিরমিজি, হাদিস ২৫১৮)

তাকওয়া মানুষকে এমন সতর্কতা দেয় যা ঈমানকে অশুদ্ধতা থেকে নিরাপদ রাখে।

তাকওয়া ঈমানের আলোকে বাড়িয়ে দেয় এবং হৃদয়ের দৃঢ়তা তৈরি করে। কুরআনে আল্লাহ বলেন:

“إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا”

— “তোমরা যদি তাকওয়া অবলম্বন করো, আল্লাহ তোমাদের জন্য সঠিক-ভুলের পার্থক্য করার শক্তি দান করবেন।”

(সূরা আল-আনফাল, ৮:২৯)

এই “ফুরকান” বা সঠিক ও ভুল পার্থক্য করার শক্তি—এটাই শক্তিশালী ঈমানের অন্যতম নিদর্শন। তাকওয়া না থাকলে মানুষ সঠিককে ভুল এবং ভুলকে সঠিক মনে করতে শুরু করে, যা আজকের যুগের বাস্তবতা।

তাকওয়া মানুষের আচরণে বিনয়, ধৈর্য, সহমর্মিতা ও সংযম সৃষ্টি করে—যা শক্তিশালী ঈমানের মূল উপাদান। কুরআনে তাকওয়াকে সফলতার শর্ত বলা হয়েছে:

“وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ”

— “পরিণাম তাকওয়াবানদের জন্য উত্তম।”

(সূরা আল-আরাফ, ৭:১২৮)

এই আয়াত দেখায়—যার তাকওয়া আছে, তার ঈমানকেই আল্লাহ সম্মানিত করেন।

সার্বিকভাবে দেখা যায়—তাকওয়া ঈমানকে রক্ষা করে, শিরক-কুফর থেকে দূরে রাখে, বড় গুনাহ থেকে বিরত রাখে, এবং আল্লাহর কাছে মানুষের মর্যাদা বাড়ায়। যে হৃদয়ে তাকওয়া থাকে, সে হৃদয়ে ঈমান স্থায়ী হয়, দৃঢ় হয় এবং আলো ছড়ায়। এই আলোই মানুষকে সন্দেহ, কামনা-বাসনা ও শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করে—যা পরবর্তী আলোচনার বিষয়।

সন্দেহ ও কামনা-বাসনা এর প্রভাব

ঈমানকে দুর্বল করার ক্ষেত্রে দুটি প্রধান শত্রু হলো—শুউবুহাত (সন্দেহ) এবং শাহাওয়াত (কামনা-বাসনা)। এই দুটি বিষয় হৃদয়ের ভেতরে এমনভাবে আঘাত করে যে মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস ও আচরণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ইসলাম মানুষের ঈমান রক্ষার জন্য বারবার সতর্ক করেছে—কখনো সত্যকে সন্দেহ দ্বারা ঢেকে ফেলতে দেওয়া যাবে না এবং কখনো কামনা-বাসনার অনুসরণ করা যাবে না। কুরআনে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে বলেন:

“فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّكَ إِنَّمَا تَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ”

— “তারা যদি তোমার ডাকে সাড়া না দেয়, তবে জেনে রাখো—তারা নিজেদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করছে।”

(সূরা আল-কাসাস, ২৮:৫০)

এই আয়াত দেখায়—শাহাওয়াত মানুষকে সত্য থেকে বিচ্যুত করার মূল কারণগুলোর একটি। শুউবুহাত (সন্দেহ) হলো এমন একটি মানসিক আঘাত, যা মানুষের হৃদয়ে প্রশ্ন, বিভ্রান্তি ও ভুল ধারণা সৃষ্টি করে। সন্দেহ তখনই জন্ম নেয় যখন মানুষ দ্বীনের বিষয়ে অপরিপূর্ণ জ্ঞান রাখে বা ভুল উৎস থেকে শিক্ষা নেয়। আধুনিক যুগে এই সন্দেহের উৎস—ইন্টারনেট, নাস্তিকতা, পশ্চিমা মতবাদ, অজ্ঞতাপূর্ণ প্রশ্নোত্তর—সবই মানুষের অন্তরে ঈমানের শিকড়কে নড়বড়ে করে।

আল্লাহ বলেন:

“فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا”

— “তাদের অন্তরে রোগ আছে, আর আল্লাহ তাদের রোগ আরও বাড়িয়ে দেন।”

(সূরা আল-বাকারাহ, ২:১০)

ইবনে কাসীর ব্যাখ্যা করেছেন—এখানে “রোগ” বলতে সন্দেহ, কপটতা ও দ্বীন সম্পর্কে বিভ্রান্তি বোঝানো হয়েছে।

(তাফসির ইবনে কাসীর, ১/৬৮)

যখন সন্দেহ হৃদয়ে প্রবেশ করে, তখন মানুষ সঠিক-ভুলের পার্থক্য করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। সত্যকে প্রশ্নবিদ্ধ মনে হয়, আর ভ্রান্তিকেই সত্য বলে মনে হতে থাকে।

বলেছেন: ﷺ রাসূল

“يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ”.

— “একসময় এমন আসবে, যখন ইসলামের কেবল নাম থাকবে।”

(বায়হাকি, শুআবুল ঈমান, হাদিস ৮০২৪)

এই হাদিসে যে সংকটের কথা বলা হয়েছে, তা অনেকাংশেই শুউবুহাতের কারণে।

অন্যদিকে শাহাওয়াত (কামনা-বাসনা) হলো মানুষের প্রবৃত্তি, লালসা ও আকাঙ্ক্ষা, যা নিয়ন্ত্রণ না করলে ঈমানকে ধ্বংস করে দেয়। কামনা-বাসনার অনুসরণ মানুষকে এমন অবস্থায়

নিয়ে যায় যে সে সত্যকে উপেক্ষা করে এবং ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

“وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ”

— “কামনা-বাসনা অনুসরণ কোরো না, তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে।”
(সূরা সাদ, ৩৮:২৬)

শাহাওয়াতের প্রভাবে মানুষ চোখের গুনাহ, জিহ্বার গুনাহ, শারীরিক গুনাহ, এবং হৃদয়ের গুনাহে লিপ্ত হয়। এ সবই অন্তরকে কঠোর করে এবং ঈমানের আলোকে দুর্বল করে। আধুনিক সমাজে নৈতিক অবক্ষয়, অশ্লীলতা, পর্নোগ্রাফি, রোমান্টিক স্বাচ্ছন্দ্য, হারাম সম্পর্ক— সতর্ক করে বলেছেন: ﷺ এসব শাহাওয়াতের আগুনকে তীব্রভাবে উসকে দেয়। রাসূল

“إِنَّ الدُّنْيَا خُلُوةٌ خَضِرَةٌ...”

— “দুনিয়া মিষ্টি ও আকর্ষণীয়...”
(সহীহ মুসলিম, হাদিস ২৭৪২)

এই আকর্ষণই মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে গুনাহের দিকে টানে। শুউবুহাত ও শাহাওয়াত এ দু’টি মিলেই মানুষের ঈমানকে দুই দিক থেকে আঘাত করে— মাথায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং হৃদয়ে কামনা-বাসনা প্রজ্বলিত করে। ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেন:

“হেদায়াতকে ধ্বংস করে এমন দু’টি জিনিস হলো—শুউবুহাত (সন্দেহ) এবং শাহাওয়াত (কামনা-বাসনা)। প্রথমটি সত্যকে ঢেকে ফেলে, দ্বিতীয়টি নফসকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।”

(ইগাসাতুল লাহফান, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৮)

সে কারণেই সন্দেহ-সৃষ্টিকারী মানুষ, বই বা কনটেন্টও ঈমানের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। কামনা-বাসনা মানুষের যুক্তিকে বিকৃত করে ফেলে। যখন নফস কোনো পাপকে আকর্ষণীয় মনে করে, তখন সে তার জন্য নানান যুক্তি দাঁড় করায়—

“এটা তো ক্ষতি করবে না”—

“সামান্য করলে সমস্যা নেই”—

“সবাই করছে”—

এগুলো নফসের তৈরি ফাঁদ।

কুরআনে আল্লাহ বলেন:

“أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ”

— “তুমি কি দেখেছ তাকে, যে নিজের কামনাকে তার উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে?”
(সূরা আল-জাথিয়া, ৪৫:২৩)

যখন কামনা-বাসনা উপাস্য হয়ে যায়, তখন ঈমানের স্থান ফাঁকা হয়ে যায়।

শুউবুহাত ও শাহাওয়াতের সম্মিলিত প্রভাবে মানুষের হৃদয় এমন অবস্থায় যায় যে সে হয় সত্য সম্পর্কে সন্দেহে পড়ে, নয়তো সত্য জানার পরও কামনা-বাসনার কারণে তা মানতে অনিচ্ছুক হয়। দু'ক্ষেত্রই ঈমানের জন্য বিপজ্জনক।

এ দুটি থেকে রক্ষা পেতে প্রয়োজন—সঠিক জ্ঞান, আল্লাহভীতি, নেক সঙ্গ, কোরআনের সাথে সম্পর্ক, এবং নফস নিয়ন্ত্রণ করার অভ্যাস। কারণ সন্দেহ ও কামনা-বাসনাই হলো সেই দু'টি দরজা, যেগুলো দিয়ে শয়তান মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করে—যা পরবর্তী আলোচনা আরও স্পষ্ট করবে।

শয়তানের প্রভাব ও ঈমান ধ্বংসের কৌশল

মানুষের ঈমানের উপর সবচেয়ে বড় আক্রমণকারী হলো শয়তান। আদম (আ.)-এর সময় থেকেই শয়তান মানুষের শত্রু, এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে তার শত্রুতা চালিয়ে যাবে। কুরআনে

আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন:

“إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا”

— “নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু, তাই তোমরাও তাকে শত্রু মনে করো।”

(সূরা ফাতির, ৩৫:৬)

শত্রু হিসেবে শয়তানের শক্তি তার অস্ত্র-শস্ত্রে নয়, বরং তার ধূর্ততা, কৌশল এবং মানুষের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতায়। শয়তানের লক্ষ্য একটাই—মানুষের ঈমান নষ্ট করা, তাকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে দেয়া, এবং শেষ পর্যন্ত তাকে হতাশা ও গুনাহের অন্ধকারে ডুবিয়ে দেয়া।

শয়তানের প্রথম আক্রমণ হয় হৃদয়ে কুমন্ত্রণা ঢুকিয়ে। কুরআনে আল্লাহ বলেন:

“مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ”

— “আমি আশ্রয় চাই কুমন্ত্রণাদানকারী শয়তানের অনিষ্ট থেকে, যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়।”

(সূরা আন-নাস, ১১৪:৪-৫)

শয়তানের মূল অস্ত্র হলো এই “ওয়াসওয়াসা”—নানা প্রশ্ন, সন্দেহ, প্রলোভন ও বিভ্রান্তি মানুষের মনে ঢুকিয়ে দেয়।

শয়তানের আরেকটি কৌশল হলো ধীরে ধীরে মানুষকে গুনাহের পথে টেনে নেয়া। সে কখনো হঠাৎ বড় গুনাহে ফেলে না; বরং ছোট ছোট গুনাহকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলে। আল্লাহ বলেন:

“وَلَا زَيْنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ”

— “আমি তাদের কাছে দুনিয়ার কাজগুলোকে সুন্দর করে সাজিয়ে দেব।”

(সূরা আল-হিজর, ১৫:৩৯)

এ সুন্দর মনে হওয়াটাই সবচেয়ে বিপজ্জনক। মানুষ মনে করে—“এটা তো ছোট বিষয়”—
এভাবেই শয়তান আস্তে আস্তে ঈমানকে ক্ষয় করে।

শয়তানের অন্যতম বড় কৌশল হলো সন্দেহ (Shubuhah) সৃষ্টি করা, বিশেষ করে আকীদা,
কোরআন, হাদিস ও ইসলামের মূলনীতিগুলো নিয়ে। সে মানুষের মনে ফিসফিস করে—

“এটা কি সত্য?”

“এটা কি যুক্তিসঙ্গত?”

“অন্য ধর্ম কি ভালো নয়?”

এ ধরনের চিন্তা মানুষকে বিভ্রান্ত করে। এমনকি সাহাবারা পর্যন্ত সন্দেহের ভয়
পেয়েছিলেন। রাসূল ﷺ বলেছেন:

“يَأْتِي الشَّيْطَانُ إِلَى أَحَدِكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟”

— “শয়তান মানুষের কাছে এসে জিজ্ঞেস করে—এটা কে সৃষ্টি করেছে? ওটা কে সৃষ্টি
 করেছে? শেষ পর্যন্ত বলে—তোমার রবকে কে সৃষ্টি করেছে?”

(সহীহ মুসলিম, হাদিস ১৩৪)

রাসূল ﷺ এই সন্দেহ আসা মানসিক রোগ নয়, বরং শয়তানের আক্রমণ বলে ব্যাখ্যা
 করেছেন এবং আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে বলেছেন।

শয়তানের আরেকটি শক্তিশালী কৌশল হলো শাহাওয়াত (কামনা-বাসনা) জাগ্রত করা। সে

মানুষের নফসের দুর্বল দিকগুলোকে কাজে লাগায়—চোখের পাপ, কান, জিহ্বা, শরীর—

এসবের মাধ্যমে মানুষের অন্তরকে দূষিত করে। কুরআনে বলা হয়েছে:

“وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ”

— “শয়তান তাদের কাজগুলোকে তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে দিয়েছে।”

(সূরা আল-‘আনকাবুত, ২৯:৩৮)

যে গুনাহকে মানুষ “আনন্দ” মনে করে—তা আসলে শয়তানের সাজানো ফাঁদ।

শয়তান আরেকটি কৌশল ব্যবহার করে — সমাজ ও পরিবেশকে দূষিত করা। সমাজ যখন

অশ্লীলতায় ভরে যায়, হারাম সহজলভ্য হয়, দীনকে দুর্বল করে এমন কনটেন্ট মানুষের

সামনে আসে—তখন শয়তান তেমন পরিবেশ ব্যবহার করে মানুষের ঈমানকে ধ্বংস করে।

শয়তানের লক্ষ্য শুধু একজন মানুষ নয়; পুরো সমাজকে প্রভাবিত করা।

শয়তানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হলো মানুষকে হতাশ করা। সে প্ররোচিত করতে
থাকে—

“তুমি অনেক গুনাহ করেছ, তোমার ক্ষমা হবে না।”

“তোমার নামাজে কি আসে যায়?”

“তোমার আমল আল্লাহ গ্রহণ করবেন না।”

কিন্তু আল্লাহ বলেন:

“لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ”

— “আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ হয়ো না।”

(সূরা আজ-জুমার, ৩৯:৫৩)

হতাশা হলো শয়তানের বড় অস্ত্র—যাতে মানুষ তওবা থেকে দূরে সরে যায়।

শয়তান মানুষের ঈমান ধ্বংসের জন্য ধর্মীয়তা বা রিয়া পর্যন্ত ব্যবহার করে। সে মানুষকে বলে—

“মানুষকে দেখাও তুমি কত ভালো।”

বলেছেন: ﷺ এভাবে নেক আমলও নষ্ট হয়ে যায়। রাসূল

“الشرك الأصغر الرياء”

— “ছোট শিরক হলো রিয়া।”

(মুসনাদ আহমদ, ২৩১১৯)

রিয়া যদি হৃদয়ে প্রবেশ করে, ঈমান বিস্মৃত থাকে না।

ক্লাসিক্যাল আলিমগণ শয়তানের কৌশল বিশ্লেষণ করে বলেছেন—শয়তানের উদ্দেশ্য হলো:

- ১) মানুষকে শিরক ও কুফরে ধাবিত করা,
- ২) না হলে বিদআতে ফেলা,
- ৩) না পারলে বড় গুনাহে লাগানো,
- ৪) না হলে ছোট গুনাহে অভ্যস্ত করা,
- ৫) এটাও না হলে নফল আমল থেকে দূরে রাখা,
- ৬) সবচেয়ে শেষে মানুষের সময় নষ্ট করানো।

(ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম, ইগাসাতুল লাহফান)

এটি শয়তানের সবচেয়ে সুসংগঠিত “ধ্বংস পরিকল্পনা”।

সার্বিকভাবে দেখা যায়—শয়তান মানুষের হৃদয়ে প্রবেশের জন্য নানান পথ ব্যবহার করে:

সন্দেহ, কামনা, পরিবেশ, হতাশা, অহংকার, রিয়া, এবং ছোট গুনাহকে সুন্দর করে দেখানো।

আর এসবের মাধ্যমে সে সবচেয়ে বেশি আঘাত করে মানুষের ঈমানের ওপর। তাই শয়তান

থেকে বাঁচতে হলে প্রয়োজন—আল্লাহর স্মরণ, কোরআনের সাথে সম্পর্ক, সঠিক জ্ঞান,

তাকওয়া, তাওয়াক্কুল এবং ধারাবাহিক ইবাদতের অভ্যাস।

এই বিষয়গুলো বুঝলে স্পষ্ট হয়—শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচার সবচেয়ে শক্তিশালী উপায় হলো তাওহীদে দৃঢ় থাকা—যা পরবর্তী আলোচনার বিষয়।

ইসলামী আকীদায় তাওহীদের গুরুত্ব

ইসলামী আকীদার মূল ভিত্তি, প্রথম শর্ত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো তাওহীদ—

অর্থাৎ আল্লাহকে তার সত্তা, গুণাবলি এবং ইবাদতে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে স্বীকার করা।

তাওহীদ ছাড়া ইসলাম নেই, ঈমান নেই, কোনো ইবাদত গ্রহণযোগ্য নয়। কুরআন ও হাদিসে

তাওহীদকে মানবজীবনের উদ্দেশ্য, ইবাদতের ভিত্তি এবং মুক্তির একমাত্র পথ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

“وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ”

— “আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য।”

(সূরা আদ-ধারিয়াত, ৫১:৫৬)

ইবাদত যখন শুধুই আল্লাহর জন্য হয়, তখনই তা তাওহীদের রূপ পায়।

তাওহীদের গুরুত্ব বোঝার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো—সমস্ত নবী ও রাসূলের দাওয়াত একই বিষয়ে একমত—আল্লাহকে এক মানো এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক কোরো না।

আল্লাহ বলেন:

“وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ”

— “আমি প্রত্যেক উম্মতের কাছে একজন রাসূল পাঠিয়েছি এই বলে—আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত থেকে দূরে থাকো।”

(সূরা আন-নাহল, ১৬:৩৬)

এখানে তাওহীদ (আল্লাহর ইবাদত) এবং শিরক থেকে দূরে থাকা—এই দুই বিষয়কেই সমস্ত নবীর মিশন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

তাওহীদ হলো এমন একটি আকীদা যা মানুষের হৃদয়কে আল্লাহর সাথে যুক্ত করে এবং

অন্য সব উপাস্য, মোহ, অহংকার, কামনা-বাসনা ও দুনিয়ার প্রলোভন থেকে মুক্ত করে।

তাওহীদের আলো হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে, শান্তি দেয় এবং স্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে। কুরআনে

বলা হয়েছে:

“أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ”

— “নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণেই হৃদয় প্রশান্তি পায়।”

(সূরা আর-রাদ, ১৩:২৮)

তাওহীদ ছাড়া মানুষ প্রকৃত প্রশান্তি পায় না, কারণ মানুষের ফিতরাত একক স্রষ্টার প্রতি নিবেদিত।

ইসলাম তাওহীদকে তিনটি প্রধান অংশে ব্যাখ্যা করেছে—

১) তাওহীদুর রুবুবিয়াহ: কর্ম ও সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহ একমাত্র রব

২) তাওহীদুল উলুহিয়াহ: ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ একমাত্র উপাস্য

৩) তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত: আল্লাহর নাম ও গুণাবলিতে তিনি অনন্য

এই তিনটি অংশ মিলে পূর্ণাঙ্গ তাওহীদ গঠিত হয়। যেকোনো অংশ অস্বীকার করলে ঈমান

অসম্পূর্ণ হয়ে যায়। ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন:

“তাওহীদ হলো সেই মূলনীতি যার উপর সমগ্র আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত।”

(মাজমু‘ ফাতাওয়া, ১/৫০)

তাওহীদ ছাড়া ঈমান প্রতিষ্ঠিত হয় না, ইবাদত গ্রহণযোগ্য হয় না এবং আখিরাতে মুক্তি পাওয়া যায় না।

বলেন: ﷺ রাসূল

“ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ”

— “যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো অংশীদার না করে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”

(সহীহ মুসলিম, হাদিস ৯৩)

তাওহীদ মানুষকে শিরক থেকে দূরে রাখে—যা সবচেয়ে বড় গুনাহ। আল্লাহ বলেন:

“ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ”

— “নিশ্চয়ই শিরক এক বড় জুলুম।”

(সূরা লোকমান, ৩১:১৩)

তাওহীদ মানুষকে নৈতিকভাবে উন্নত করে। কারণ যখন মানুষ আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর কাছে জবাবদিহিতা অনুভব করে, তখন সে অন্যায়ের পথে যায় না। অনেক মানুষ দুনিয়ার আইনের ভয় না পেলেও আল্লাহর ভয় হৃদয়ে থাকলে গুনাহ থেকে দূরে থাকে।

তাওহীদ আত্মবিশ্বাসও তৈরি করে। একজন মুমিন জানে—

“ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ”

— “আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।”

(সূরা আলে-ইমরান, ৩:১৭৩)

যে ব্যক্তি আল্লাহকে একমাত্র নির্ভরযোগ্য মানে, তার মন ভেঙে পড়ে না, দুঃখে হতাশ হয় না, এবং কষ্টে ভীত হয় না।

তাওহীদ ঈমানকে এমন শক্ত ভিত্তি দেয় যা সভ্যতার চাপ, সন্দেহবাদ, আধুনিক দুনিয়ার প্রলোভন, এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা—সবকিছুর বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিতে সাহায্য করে।

আধুনিক যুগের নাস্তিকতা, মানববাদ, ভোগবাদ, লিবারেল চিন্তাধারা—এসব বিভ্রান্তির মোকাবিলায় তাওহীদই মানুষের অন্তরকে নিরাপদ রাখে।

সার্বিকভাবে দেখা যায়—তাওহীদ শুধু একটি আকীদা নয়; বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের ভয়কে আল্লাহর প্রতি কেন্দ্রীভূত করে, ভালোবাসাকে আল্লাহর আনুগত্যে পরিচালিত করে, এবং কর্মকে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে ধাবিত করে। তাওহীদ যত দৃঢ় হবে, ঈমান তত শক্তিশালী হবে, গুনাহ তত কমবে, এবং মানুষের জীবন তত আলোকিত হবে।

এই তাওহীদের আলোই প্রকৃত ঈমানকে তাওয়াক্কুল, ধৈর্য ও আল্লাহর প্রতি ভরসার পথে নিয়ে যায়—যা পরবর্তী আলোচনায় আরও স্পষ্ট হবে।

ঈমান ও তাওয়াক্কুলের সম্পর্ক

ঈমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফল এবং লক্ষণ হলো তাওয়াক্কুল—অর্থাৎ আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভরতা। তাওয়াক্কুল এমন একটি আধ্যাত্মিক শক্তি যা মুমিনের হৃদয়কে স্থিরতা, সাহস এবং প্রশান্তি প্রদান করে। ইসলাম তাওয়াক্কুলকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা

করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

“وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ”

— “তোমরা যদি মুমিন হও, তবে আল্লাহর উপরই ভরসা করো।”

(সূরা আল-মায়দা, ৫:২৩)

এ আয়াত স্পষ্ট করে যে তাওয়াক্কুল ঈমানের শর্তস্বরূপ—সত্যিকার ঈমান কখনো তাওয়াক্কুল ছাড়া পূর্ণতা লাভ করে না।

মানুষের জীবনে সিদ্ধান্ত, বিপদ, সঙ্কট, দুঃখ-কষ্ট—এসব কখনোই শেষ হয় না। এ সবকিছুর মাঝে একজন মুমিন যেভাবে স্থিতিশীল থাকতে পারে, তা হলো আল্লাহর উপর নির্ভর করা।

আল্লাহ বলেন:

“وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ”

— “যে আল্লাহর উপর নির্ভর করে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট।”

(সূরা আত-তালাক, ৬৫:৩)

এই “হাসবুহু”—অর্থাৎ “আল্লাহই যথেষ্ট”—এটাই সেই শক্তি যা ঈমানকে জীবন্ত রাখে।

তাওয়াক্কুল কখনো অলসতার নাম না বরং ঈমানের পরিপূর্ণতার একটি মানদণ্ড। মুমিন চেষ্টা করে, পরিশ্রম করে, ব্যবস্থা গ্রহণ করে—তারপর ফলাফল আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে।

বলেছেন: ﷺ রাসূল

“أَحْرَصُ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَأَسْتَعِينُ بِاللَّهِ”

— “যা তোমার উপকারে আসে সে বিষয়ে যত্নবান হও এবং আল্লাহর সাহায্য চাও।”

(সহীহ মুসলিম, হাদিস ২৬৬৪)

এ হাদিস দেখায়—তাওয়াক্কুল হলো চেষ্টা ও দোয়ার সমন্বয়ে গঠিত।

তাওয়াক্কুল এমন একটি গুণ যা মানুষের হৃদয় থেকে ভয়, দুশ্চিন্তা এবং অতিরিক্ত নির্ভরতার প্রবণতা দূর করে দেয়। যখন একজন মুমিন আল্লাহর উপর ভরসা করে, তখন বাহ্যিক চাপ বা অন্যায় তাকে দুর্বল করে না। মূসা (আ.) যখন ফেরাউনের বাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে

পড়েন, তখন তাঁর সাথীরা ভয় পেলেও তিনি বলেছিলেন:

“كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ”

— “না, কখনোই না; আমার রব আমার সাথে আছেন—তিনি আমাকে অবশ্যই পথ দেখাবেন।”

(সূরা আশ-শু‘আরা, ২৬:৬২)

এই দৃঢ়তা তাওয়াক্কুলের ফল, আর এ ধরনের দৃঢ়তা কেবল শক্তিশালী ঈমান থেকেই জন্মে।

তাওয়াক্কুল মানুষের চরিত্রে বিনয় ও আল্লাহর প্রতি আস্থা জন্মায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে, সে অহংকার করে না, কারণ সে জানে—উপকার-অপকার সবই আল্লাহর বিধান। কুরআনে বলা হয়েছে:

“وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ”

— “তারা তাদের রবের উপরই নির্ভর করে।”

(সূরা আল-আনফাল, ৮:২)

আসলে এই আয়াতেই ঈমানের উচ্চ মর্যাদার পরিচয় দেওয়া হয়েছে—কারণ আল্লাহভীতি, কোরআন শোনা, ঈমান বৃদ্ধি এবং তাওয়াক্কুল—এগুলো একসাথে আসে শক্তিশালী হৃদয়ে। তাওয়াক্কুল মানুষকে দুনিয়ার পরীক্ষায় পরিপক্ব করে তোলে। যখন কেউ আল্লাহর উপর ভরসা করে, তখন সে হারাম উপায় গ্রহণ করে না, কারণ সে জানে—হালাল রিজিকই বরকতময়। সে উদ্বেগে পুড়ে যায় না, কারণ সে জানে—আল্লাহর লেখা তাকদীরই শ্রেষ্ঠ। তাই তাওয়াক্কুল মানুষকে মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে শক্তিশালী করে।

রাসূল ﷺ একটি গভীর উদাহরণ দিয়ে তাওয়াক্কুলের বাস্তবতা ব্যাখ্যা করেছেন:

“لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقْنَاكُمْ كَمَا تَرْزُقُ الطَّيْرُ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا”

— “তোমরা যদি আল্লাহর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল করতে, তবে তোমাদেরকে এমনভাবে রিজিক দেওয়া হতো যেমন পাখিকে দেওয়া হয়—সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হয়, সন্ধ্যায় পেট ভরে ফিরে আসে।”

(সুনান তিরমিজি, হাদিস ২৩৪৪)

এ হাদিস বোঝায়—তাওয়াক্কুল হলো আমল + আস্থা; অলসতা নয়।

একজন মুমিনের ঈমান যত শক্তিশালী হয়, তার তাওয়াক্কুলও তত গভীর হয়। আর যার তাওয়াক্কুল সত্যিকারের, সে কখনো শিরক, রিয়া, হতাশা, ভয় বা মানুষের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতায় আক্রান্ত হয় না। তাওয়াক্কুল ঈমানকে পরিপক্ব করে, স্থিতিশীল রাখে এবং মানুষকে আল্লাহভীরু ও আত্মবিশ্বাসী করে তোলে।

সার্বিকভাবে তাওয়াক্কুল হলো ঈমানের প্রাণশক্তি—যা মুমিনকে ভরসা, সাহস, ধৈর্য এবং আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্কের পথে এগিয়ে নেয়। তাওয়াক্কুল ছাড়া ঈমান অসম্পূর্ণ; আর ঈমান ছাড়া তাওয়াক্কুলের কোনো মূল্য নেই।

ঈমান ও নৈতিকতা গঠনের ভূমিকা

ইসলামী দৃষ্টিতে ঈমান শুধু একটি আত্মিক ধারণা বা তাত্ত্বিক বিশ্বাস নয়; বরং এর বাস্তব প্রতিফলন মানুষের নৈতিকতা ও চরিত্রে প্রকাশ পায়। এ কারণে ইসলাম নৈতিকতা বা *Akhlaq*-কে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছে। একজন মানুষের ঈমান যত দৃঢ় হয়, তার চরিত্র তত উন্নত হয়—এটাই ইসলামের শিক্ষা। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:

“وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ”

) উত্তম চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।” — “নিঃসন্দেহে তুমি (মুহাম্মদ (সূরা আল-কলম, ৬৮:৪)

রাসূল ﷺ ছিলেন সর্বোচ্চ চরিত্রের অধিকারী, এবং এ চরিত্র তাঁর পরিপূর্ণ ঈমানের ফল।

ঈমান ও নৈতিকতার সম্পর্ক এতটাই গভীর যে হাদিসে চরিত্রকে ঈমানের পরিমাপ হিসেবে বলেছেন: ﷺ উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূল

“أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا”

— “মুমিনদের মধ্যে ঈমানের দিক থেকে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি যার চরিত্র সর্বোত্তম।” (সুনান তিরমিজি, হাদিস ১১৬২)

এই হাদিস প্রমাণ করে—চরিত্র যত উন্নত, ঈমানও তত উচ্চ।

ইসলামে নৈতিকতার উদ্দেশ্য শুধু সামাজিক সম্পর্ক ঠিক রাখা নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। একজন মুমিনের চরিত্র তার ঈমানের প্রতিফলন। যখন তার অন্তর আল্লাহভীতিতে ভরে যায়, তখন তার কথা, আচরণ, ব্যবহার সব আল্লাহর নীতিমালার আলোকে গঠিত হয়। নৈতিকতা তখন কৃত্রিম আচরণ নয়; বরং ঈমানের আলো থেকে উৎসারিত একটি জীবন্ত বাস্তবতা।

নৈতিকতা গঠনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সত্যবাদিতা। মিথ্যা কখনো

বলেছেন: ﷺ শক্তিশালী ঈমানের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। রাসূল

“عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ”

— “তোমরা সত্যবাদী হও; কারণ সত্য মানুষকে নেকির দিকে নিয়ে যায়।” (সহীহ মুসলিম, হাদিস ২৬০৭)

সত্যবাদী হৃদয়ই ঈমানের আলো ধারণ করতে পারে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক গুণ হলো সহানুভূতি ও দয়া। একজন মুমিন অপরের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে শুধু মানবিকতার কারণে নয়; বরং আল্লাহর আদেশ মানার জন্য। রাসূল

বলেন:

“لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ”

— “যে মানুষকে দয়া করে না, আল্লাহও তাকে দয়া করেন না।”
(সহীহ বুখারী, হাদিস ৭৩৭৬)

দয়া হলো ঈমানের জীবন্ত প্রতিফলন।

ধৈর্য ও সংযম নৈতিকতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ, যা সরাসরি ঈমান থেকে উৎসারিত।

আল্লাহ বলেন:

“إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ”

— “নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।”

(সূরা আল-বাকারা, ২:১৫৩)

একজন মানুষের যখন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় হয়, তখন সে বিপদে ধৈর্য ধরতে পারে, দুশ্চিন্তায় স্থির থাকতে পারে—এই স্থিরতাই ভালো চরিত্রের মূল উৎস।

গীবত, অহংকার, প্রতারণা, রাগ, হিংসা, কুদৃষ্টি—এসব নৈতিক দুর্বলতা ঈমানের দুর্বলতারই লক্ষণ। যখন ঈমান হৃদয়ে শক্তিশালী থাকে, তখন এ সব নেতিবাচক গুণ দূর হয়ে যায়।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন:

“চরিত্রের সংশোধন না হলে ঈমান পূর্ণতা পায় না, আর হৃদয় বিশুদ্ধ না হলে নৈতিকতা সুন্দর হয় না।”

(মাদারিজুস সালিকীন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৯৩)

ঈমান নৈতিকতাকে গঠন করে এবং নৈতিকতা আবার ঈমানকে পরিশুদ্ধ করে—এ দুটি একে অপরের পরিপূরক।

ইসলামের শিক্ষা হলো—একজন মুসলিমের চরিত্র যেন এমন হয় যে মানুষ তার কাছ থেকে বলেছেন: ﷺ নিরাপত্তা, ন্যায়পরায়ণতা এবং সদাচরণ পাবে। রাসূল

“الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ”

— “সেই ব্যক্তি মুসলিম, যার জিহ্বা ও হাত থেকে মানুষ নিরাপদ থাকে।”

(সহীহ বুখারী, হাদিস ১০)

এ নিরাপত্তার অনুভূতি নৈতিকতার গভীরতম প্রকাশ।

সার্বিকভাবে দেখা যায়—ঈমান যদি হৃদয়ে সত্যিকারভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে নৈতিক চরিত্র তার স্বাভাবিক ফলাফল হিসেবে প্রকাশ পায়। ধার্মিকতা ও নৈতিকতা আলাদা দুই বিষয় নয়; বরং একে অপরের ছায়া। একজন মু’মিনের শক্তিশালী ঈমান তাকে ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু, সত্যবাদী, ধৈর্যশীল, বিনয়ী—এমন আদর্শ গুণে গঠিত করে। আর এরাই ইসলামের প্রকৃত প্রতিনিধি।

পরবর্তী আলোচনায় কুরআন ও হাদিসে ঈমান সম্পর্কিত নীতিমালা আরও পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হবে।

কুরআন ও হাদীসে ঈমান বিষয়ক নীতিমালা

কুরআন ও সহীহ হাদীস ইসলামী আকীদার মূল উৎস, আর ঈমান সম্পর্কিত নীতিমালা সম্পূর্ণভাবে এই দুই উৎস থেকেই নির্ধারিত। কুরআন ও হাদীস ঈমানকে শুধু একটি বিশ্বাসের নাম নয়; বরং এমন একটি জীবনবোধ হিসেবে ব্যাখ্যা করে যেখানে হৃদয়, জিহ্বা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—এই তিনটি স্তরের সক্রিয় ভূমিকা থাকে। ঈমান বিষয়ক নীতিগুলো এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে একজন মুসলিম শুধুমাত্র বিশ্বাসেই নয়, বরং আচরণ, নৈতিকতা, চিন্তাধারা এবং সমাজিক অবস্থানেও ঈমানের প্রভাব অনুভব করে।

কুরআন ঈমানকে এমন একটি আলো হিসেবে বর্ণনা করেছে, যা মানুষের অন্তরে স্থাপন করা হয়। আল্লাহ বলেন:

“لِلَّهِ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ”

— “আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক; তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনেন।”

(সূরা আল-বাকারা, ২:২৫৭)

এই আয়াত নির্দেশ করে যে ঈমানের প্রথম নীতিমালা হলো—আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন এবং আল্লাহর নির্দেশে জীবন পরিচালনা করা। ঈমান কোনো অভ্যন্তরীণ অনুভূতির নাম নয়; বরং একটি আলোকিত পথ।

কুরআন ঈমানকে বৃদ্ধি ও হ্রাসযোগ্য হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে। আল্লাহ বলেন:

“لِيَزِدَّاكُمْ إِيْمَانًا مَّعَ إِيْمَانِهِمْ”

— “যেন তারা তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বৃদ্ধি করতে পারে।”

(সূরা আল-ফাতহা, ৪৮:৪)

এ থেকে জানা যায়—ঈমান স্থির নয়; আমল, জ্ঞান, খুশু, ধৈর্য, নেক সঙ্গ, কোরআন তিলাওয়াত—এসবের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায়। আর গুনাহ, অবহেলা ও হৃদয়ের কঠোরতা ঈমান কমিয়ে দেয়।

কুরআনের একটি মৌলিক নীতিমালা হলো—ঈমান ও আমল একে অপরের সাথে

অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। আল্লাহ প্রায় সর্বত্র বলেন:

“إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ”

— “যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে।”

(কুরআনে বহু স্থানে)

কুরআনে ঈমানের সঙ্গে আমল এতটাই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত যে আলিমগণ বলেছেন—

“কোরআনে যেখানে ঈমান এসেছে, সেখানে প্রায় সব জায়গায় তার সাথে আমলও উল্লেখ আছে।”

এটি প্রমাণ করে—আমলহীন ঈমান কেবল একটি দাবি, প্রমাণ নয়।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা হলো—ঈমানের ভিত্তি হলো তাওহীদ, এবং শিরক ঈমানকে ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ বলেন:

“ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ”

— “আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করা ক্ষমা করেন না।”

(সূরা আন-নিসা, ৪:৪৮)

অর্থাৎ, তাওহীদ হলো ঈমানের শর্ত, আর শিরক হলো ঈমানের বাতিলকারী।

বলেছেন: ﷺ হাদীসে ঈমানের নীতিমালাকে আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রাসূল
“ الْإِيمَانُ بضع وسبعون شُعْبَةً، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمطة الأذى عن الطريق،
والحياء شعبة من الإيمان ”

— “ঈমানের সত্তরাধিক শাখা রয়েছে। এর সর্বোচ্চ হলো ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলা, আর
সর্বনিম্ন হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা।”
(সহীহ মুসলিম, হাদিস ৩৫)

এই হাদিস ঈমানের ব্যাপ্তি ও বাস্তবতা তুলে ধরে—ঈমান শুধুই একটি শব্দ নয়, বরং বিশাল
একটি শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট কাঠামো।

কুরআন ও হাদীসের আরেকটি নীতিমালা হলো—ঈমান আল্লাহর আদেশ মানা এবং
নিষেধাজ্ঞা থেকে দূরে থাকা। কুরআনে বলা হয়েছে:

“ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ”

— “আমরা শুনলাম এবং মান্য করলাম।”

(সূরা আল-বাকারা, ২:২৮৫)

মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো—সে আল্লাহর হুকুম প্রশ্নবিদ্ধ করে না; বরং তা পালন করার চেষ্টা
করে।

বলেছেন: ﷺ হাদীসে ঈমানের নৈতিক ও সামাজিক দিকগুলোও স্পষ্ট করা হয়েছে। রাসূল
“ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ”

— “তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেই
জিনিসই পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।”
(সহীহ বুখারী, হাদিস ১৩)

এ নীতিমালা নির্দেশ করে—ঈমানের অংশ হলো পরস্পরের প্রতি দয়া, ভালোবাসা,
ন্যায়বিচার ও সহমর্মিতা।

কুরআন ও হাদীস ঈমানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উল্লেখ করেছে—ভয় এবং আশা
একসাথে থাকা। আল্লাহ বলেন:

“ يَذْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ”

— “তারা তাদের রবকে ভয় এবং আশা নিয়ে ডাকে।”

(সূরা আস-সাজদা, ৩২:১৬)

অর্থাৎ ঈমানের মানদণ্ড হলো—আল্লাহর শাস্তির ভয় এবং তাঁর রহমতের প্রত্যাশা।

তিনবার ﷻহাদীসে আরেকটি নীতিমালা পাওয়া যায়—হৃদয় ঈমানের আসল স্থান। রাসূল
তাঁর বুকে ইশারা করে বলেছেন:

“التقوى هاهنا”

— “তাকওয়া এখানে।”

(সহীহ মুসলিম, হাদিস ২৫৬৪)

এই বক্তব্য নির্দেশ করে—বিশ্বাসের ভিত্তি হৃদয়ে, কিন্তু তার প্রমাণ আমলে।
সার্বিকভাবে দেখা যায়—কুরআন ও হাদীস ঈমানকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে
নির্ধারণ করেছে। এতে হৃদয়ের বিশ্বাস, জিহ্বার স্বীকৃতি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল
সমন্বিতভাবে ঈমানের কাঠামো সৃষ্টি করে। ঈমান কেবল তত্ত্ব নয়; বরং বাস্তব আচরণ,
চরিত্র, নৈতিকতা এবং আল্লাহর আনুগত্যের ধারাবাহিকতার নাম। এই নীতিমালাগুলো বুঝলে
স্পষ্ট হয়—ঈমান সঠিক রাখার জন্য জ্ঞানের গভীরতা, তাওহীদের দৃঢ়তা, নৈতিকতার সৌন্দর্য
এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা অপরিহার্য।

ভ্রান্ত মতবাদসমূহ (খারেজি, মুরজিয়া, মু‘তাযিলা)

ইসলামের ইতিহাসে এমন কিছু মতবাদ উদ্ভব হয়েছে, যেগুলো মুসলিম সমাজে গুরুতর
বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে এবং ঈমানের ধারণাকে বিকৃত করেছে। বিশেষ করে আকীদাগত
বিষয়ে তাদের ভুল ব্যাখ্যা মানুষকে চরমপন্থা, শিথিলতা বা যুক্তিবাদী বিকৃতি—এ তিন রকম
বিপদের দিকে ঠেলে দিয়েছে। খারেজি, মুরজিয়া এবং মু‘তাযিলা—এই তিনটি মতবাদ
ইসলামী আকীদার ইতিহাসে সবচেয়ে আলোচিত ভ্রান্ত পথগুলোর মধ্যে অন্যতম। এসব
মতবাদ উদ্ভূত হয়েছিল রাজনৈতিক অস্থিরতা, জ্ঞানহীনতা এবং ধর্মীয় বিষয়কে ভুলভাবে
ব্যাখ্যা করার প্রবণতা থেকে। তাদের ভুল ধারণা বুঝতে পারলে সুন্নাহভিত্তিক সঠিক আকীদা
আরও পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

প্রথমত—খারেজি মতবাদ ইসলামি ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাচীন দলগুলোর একটি। এদের
উৎপত্তি হয়েছিল সিফফিন যুদ্ধের পরবর্তী রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব থেকে। তারা আলী (রা.)-এর
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং নিজেদের দলকে “উন্নত মুমিন” বলে মনে করত। তাদের মূল
ভুল ধারণা ছিল—“বড় গুনাহ করলে মানুষ কাফির হয়ে যায়।” তারা ঈমানকে এমনভাবে
কঠোর করে ফেলেছিল যে মানুষের সামান্যতম ভুল বা গুনাহকেও তারা কুফর হিসেবে
বিস্তারিত বিবেচনা করত। কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে এ ধারণা স্পষ্টতই ভ্রান্ত। কারণ রাসূল
বলেছেন:

“مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَاكَ الْمُسْلِمُ لَهُ مَا لَنَا وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا”.

— “যে আমাদের মতো নামাজ পড়ে, আমাদের কিবলামুখী হয় এবং আমাদের জবাই খায়—
সে মুসলিম; তার অধিকার আমাদের মতোই।”
(সহীহ বুখারী, হাদিস ৩৯১)

এ থেকে বোঝা যায়—কর্মের কারণে তৎক্ষণাৎ কাউকে কাফির বলা ইসলামে অনুমোদিত নয়। খারেজিরা এ নীতিকে অস্বীকার করে মানুষকে দ্রুত তাকফির করত, যা আজও অনেক চরমপন্থী সংগঠনের মূল ভিত্তি।

দ্বিতীয়ত—মুরজিয়া মতবাদ, যারা খারেজিদের চরমপন্থার বিপরীত দিকে গিয়ে অত্যধিক শিথিলতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। তাদের ভুল ধারণা ছিল—“কর্ম ঈমানের অংশ নয়।” তারা বলত, ঈমান শুধু অন্তরের বিশ্বাস এবং জিহ্বার স্বীকৃতির নাম; কাজ বা আমল ঈমানের প্রভাবিতকারী নয়। ফলে তাদের মতে—একজন ব্যক্তি যত বড় গুনাহই করুক না কেন, তার ঈমান সম্পূর্ণ অটুট থাকে। এই মতবাদ ঈমান ও আমলের সম্পর্ককে ছিন্ন করেছে, অথচ কুরআন স্পষ্টভাবে বলে:

“إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ”

— “যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে।”

(কুরআনে বহু স্থানে)

সাহাবা, তাবেঈন ও ইমামগণ সর্বসম্মতভাবে বলেছেন—ঈমান বৃদ্ধি-হ্রাস পায়, এবং আমল এর অপরিহার্য অংশ। মুরজিয়া মতবাদ এ বাস্তবতাকে অস্বীকার করে মানুষকে আত্মতুষ্টি ও গুনাহে উৎসাহিত করে।

তৃতীয়ত—মু‘তাযিলা মতবাদ, যা বুদ্ধিবাদী একটি দলে পরিণত হয়েছিল। এদের মূল ভুল ধারণা ছিল—ধর্মীয় সত্যকে বুদ্ধির অগ্রাধিকার দিয়ে বিচার করা। তারা বলত—“আল্লাহর গুণাবলি বাস্তব না, বরং প্রতীকী”—অর্থাৎ তারা আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার বা বিকৃত করত। তারা কোরআনকে “মাখলুক” বা সৃষ্টি—এ দাবি করত, যা সুন্নাহবিরোধী একটি মারাত্মক ভুল। ইমাম আহমদ (রহ.) এমন দাবির বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নিয়েছিলেন এবং বলেছেন—

“যে ব্যক্তি বলে কোরআন সৃষ্টি—সে পথভ্রষ্ট।”

(সিয়রু আ‘লামিন নুবালা, খণ্ড ১১)

মু‘তাযিলারা ঈমান-কুফরের মাঝে একটি “মধ্যবর্তী অবস্থান” দাবি করত—এটিও ইসলামী আকীদার বিরোধী। কারণ ইসলাম মানুষকে হয় মুমিন নয়তো কাফির হিসেবে চিহ্নিত করে; মাঝামাঝি কোনো অবস্থা নেই।

এই তিনটি ভ্রান্ত মতবাদ ইসলামের শুদ্ধ আকীদায় বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি করেছে। খারেজিরা কঠোরতার দ্বারা মানুষকে বিভক্ত করেছে; মুরজিয়া শিথিলতার দ্বারা আমলের গুরুত্ব নষ্ট করেছে; এবং মু‘তাযিলা যুক্তিবাদের নামে ওহীর সার্বভৌমত্ব নষ্ট করেছে। অথচ সুন্নাহর পথ হলো মধ্যপন্থা—যেখানে ঈমান হলো বিশ্বাস, স্বীকৃতি ও আমলের সমন্বয়ে গঠিত; যেখানে

আল্লাহর সীফাতকে তাঁর মতো করেই মানা হয়; যেখানে বড় গুনাহ করেও মানুষ ঈমান থেকে বের হয়ে যায় না; আবার গুনাহকে হালকা করে দেখারও সুযোগ নেই। আজকের যুগে এ ভ্রান্ত মতবাদগুলোর রূপ আরও জটিল হয়ে সামাজিক, রাজনৈতিক, বুদ্ধিবাদী ও প্রচারমাধ্যমের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। কখনো এটি চরমপন্থার নামে, কখনো উদারপন্থার নামে, কখনো নাস্তিক্যবাদী যুক্তির ছদ্মবেশে। তাই এ মতবাদগুলো সম্পর্কে জানা এবং এদের ভুল চিন্তাধারা থেকে দূরে থাকা ঈমান রক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সার্বিকভাবে বলা যায়—খারেজি চরমতা, মুরজিয়ার শিথিলতা এবং মু'তায়িলার যুক্তিবাদী বিকৃতি—এই তিনটি প্রবণতা প্রকাশ করে যে সঠিক আকীদা সর্বদাই মধ্যপন্থা, যেখানে কোরআন-সুন্নাহর নির্দেশ সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব ধারণ করে এবং মানবমনের পক্ষপাত বা রাজনৈতিক স্বার্থ আকীদাকে প্রভাবিত করতে পারে না। সঠিক ঈমান সংরক্ষণের জন্য এই ভ্রান্ত পন্থাগুলো থেকে দূরে থাকা এবং সুন্নাহর পথে অবিচল থাকা অপরিহার্য।

উপসংহার

ঈমান ইসলামী জীবনের কেন্দ্রীয় ভিত্তি, এবং এর সঠিক উপলব্ধি ছাড়া একজন মুসলিমের বিশ্বাস, চরিত্র, আমল ও নৈতিকতা কোনো ক্ষেত্রেই পরিপূর্ণ হতে পারে না। এই গবেষণায় ঈমানের সংজ্ঞা, প্রকৃতি, শর্ত, উপাদান, বৃদ্ধি-হ্রাস, নৈতিক সম্পর্ক, ঈমান ভঙ্গের কারণ, আধুনিক চ্যালেঞ্জ এবং ভুল মতবাদের প্রভাব—এসব বিষয়কে কুরআন, সহীহ হাদীস ও ইসলামের ক্লাসিক্যাল উৎসের আলোকে তুলে ধরা হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল—একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সামনে আনা, যা একজন মুসলিমকে তার ঈমানকে বুঝতে, যাচাই করতে এবং সংরক্ষণ করতে সহায়তা করবে।

গবেষণার আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে ঈমান কেবল একটি তাত্ত্বিক বিশ্বাস নয়; বরং তা হৃদয়ের দৃঢ় স্বীকৃতি, জিহ্বার ঘোষণা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের সমন্বয়ে গঠিত। ঈমান একটি জীবন্ত শক্তি, যা বৃদ্ধি-হ্রাস পেতে পারে। কুরআনের তিলাওয়াত, আল্লাহর স্মরণ, ধারাবাহিক ইবাদত, নেক সঙ্গ, আত্মশুদ্ধি এবং তাকওয়া—এসব ঈমানকে দৃঢ় করে। অপরদিকে গুনাহ, অবহেলা, খারাপ সঙ্গ, অশ্লীলতা, সন্দেহ এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা ঈমানকে দুর্বল করে দেয়।

এ গবেষণায় আরও দেখা যায়—ঈমানকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে তাওহীদ হলো সর্বোচ্চ স্তম্ভ। শিরক ঈমানকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে, আর তাওহীদের গভীর উপলব্ধি মানুষকে শিরক, বিদআত, কুফর ও ভ্রান্ত পন্থা থেকে দূরে রাখে। তাওয়াক্কুল, তাকওয়া, ধৈর্য, সত্যবাদিতা, দয়া, নৈতিকতা—এসব গুণ শক্তিশালী ঈমানের অবিচ্ছেদ্য ফল। একজন মুমিনের চরিত্র সত্যিকার অর্থে তার ঈমানের পরিমাপক।

আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জগুলো—যেমন নাস্তিক্যবাদ, বস্তুবাদ, লিবারেল মতবাদ, অশ্লীলতা, ইন্টারনেট সংস্কৃতি, সামাজিক চাপ এবং ভ্রান্ত গোষ্ঠীর চিন্তাধারা—ঈমানের উপর গভীর আঘাত হানে। তরুণ প্রজন্ম বিশেষভাবে এ নৈতিক ও ভাবগত স্রোতের বিপরীতে সংগ্রাম করছে। সন্দেহ (Shubuhāt) ও কামনা-বাসনা (Shahawat) আজকের যুগে শয়তানের প্রধান অস্ত্র হিসেবে কাজ করছে, যা মানুষের মন-বুদ্ধি-হৃদয়কে বিপর্যস্ত করে। তাই আজ ঈমান সংরক্ষণ শুধু ব্যক্তিগত দায়িত্ব নয়; বরং সামাজিক ও প্রজন্মগত দায়িত্ব।

খারেজি, মুরজিয়া এবং মু‘তাজিলা—এসব ভুল মতবাদের ইতিহাস প্রমাণ করে যে সঠিক আকীদা হলো মধ্যপন্থা, যেখানে না চরমতার স্থান আছে, না শিথিলতার। সুন্নাহর পথ হলো—বিশ্বাস, আমল, নৈতিকতা এবং জ্ঞানের সমন্বয়। এ পথই মুমিনের হৃদয়কে অটুট রাখে। এ গবেষণা শেষে পরিষ্কারভাবে বলা যায়—ঈমান রক্ষার জন্য প্রয়োজন সঠিক জ্ঞান, হৃদয়ের তাকওয়া, নৈতিকতার সৌন্দর্য, ধারাবাহিক ইবাদত, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল এবং শিরক-কুফর-বিদআত-গুনাহ থেকে দূরে থাকার দৃঢ় সংকল্প। ঈমান রক্ষা কোনো মুহূর্তের কাজ নয়; বরং এটি আজীবন চলমান একটি আত্মিক সংগ্রাম। যার অন্তরে আল্লাহভীতি থাকবে, কোরআনের আলো থাকবে, এবং সুন্নাহর দিশা থাকবে—তার ঈমান আল্লাহর ইচ্ছায় সুরক্ষিত থাকবে।

শেষ পর্যন্ত, ঈমান এমন এক অমূল্য সম্পদ যা হারালে সবকিছু হারিয়ে যায়; আর সংরক্ষণ করতে পারলে দুনিয়া-আখিরাত উভয়ই সফল হয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে পরিপূর্ণ ঈমান, শক্তিশালী আকীদা, শিরক ও গুনাহ থেকে মুক্ত জীবন এবং কোরআন-সুন্নাহর পথে অটল থাকার তাওফীক দান করুন।

“ رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ”

— “হে আমাদের রব! তুমি আমাদের হিদায়াত দেওয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র করে দিও না।”

(সূরা আলে-ইমরান, ৩:৮)